মুসলিম মনীষীদের
ছেলেবেলা
রশীদ বুক হাউস

মুসলিম মনীষীদের ছেলেবেলা

হারুনুর রশিদ এম.এ. (ডাবল)

এম. এইচ. পাবলিকেশন্স
৭ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন
প্যারীদাস রোড, ঢাকা

মুসলিম মনীষীদের ছেলেবেলা

হারুনুর রশিদ
"চায়না ছায়া"
১৮০০, নর্থ সাউথ রোড,
পূর্ব ধনিয়া, ঢাকা - ১২০৪

প্রকাশক ঃ
এম. এইচ, পাবলিকেশন্স এর পক্ষে
এ, কে, এম, মাছুদুর রহমান খান
৭ নং, জয় চন্দ্র ঘোষ লেন
প্যারীদাস রোড, ঢাকা - ১১০০।

২য় প্রকাশ ঃ ১৯৯৪ ইং

৪র্থ সংস্করণ ঃ ২০০৪ইং

মুদ্রণে ঃ
নাছিম প্রিন্টিং প্রেস এণ্ড কম্পিউটার্স
৭ নং, জয় চন্দ্র ঘোষ লেন
প্যারীদাস রোড, ঢাকা - ১১০০।

মূল্য ঃ ৬৫.০০ টাকা মাত্র

MUSLIM MONISHEDER CHELEBELA
(Childhood of the Muslim Scholer's) written by Harounur Rashid in Bengali I Published
***M. H. Publications.** Dhaka.*

উৎসর্গ

মা মণি

জামানী মরিয়ামকে

প্রকাশকের কথা

মুসলিম জগতে বহু ক্ষণজন্মা মনীষী জন্মেছেন, যাঁরা শুধু তাঁদের যুগেই নন, বর্তমান যুগেও আদর্শ অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্মরণীয়। কালজয়ী প্রতিভা হিসেবে তাঁরা সর্বজনস্বীকৃত।

এই মানব সভ্যতাকে তারা নানাভাবে এগিয়ে দিয়ে গেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, গণিতশাস্ত্র, রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃ-এমন কোন বিষয় নেই, যেগুলো তাঁদের প্রতিভার যাদুস্পর্শে মানব সভ্যতার দিকদর্শন হয়ে ওঠেনি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু বিষয়েই তাঁরা ছিলেন পথিকৃৎ। বলতে গেলে জ্ঞানের দীপাধারটি তাঁরাই জ্বালিয়ে দিয়েছেন যার আলোক রশ্মি কুসংস্কার তথা অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করে মানব জাতির সামনে খুলে দিয়েছে জ্ঞানের দুয়ার।

মুসলিম মনীষীদের এই কালোত্তীর্ণ প্রতিভার অফুরন্ত অবদান সম্পর্কে আমাদের ছেলেমেয়েরা অতি অল্পই জানে। এটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুঃখজনক। সেই সঙ্গে পীড়াদায়কও বটে। নিজেদের পূর্বসুরী মনীষীদের অবদান সম্পর্কে অজ্ঞতা তথা জ্ঞানের এই লজ্জাকর অভাব যত তাড়াতাড়ি পূরণ করা যায়, জাতির জন্য তা হবে ততই মঙ্গলজনক।

সেই অভাব যৎকিঞ্চিৎ পূরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই কয়েকজন মুসলিম মনীষীর ছেলেবেলার কাহিনী এ বইটিতে তুলে ধরার সামান্য প্রয়াস নিয়েছি আমরা। তাঁদের অবিস্মরণীয় আদর্শ জীবন কাহিনী জেনে আমাদের শিশু-কিশোররা উৎসাহিত হোক, এটাই আমাদের একান্ত কামনা।

আল্লাহ্ আমাদের এ উদ্দেশ্য সফল করুন।

দুটি কথা

দুনিয়াতে কত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে, তা কে জানে! জন্মের পর তারা হাসে কাঁদে, কিছু কাল সময় কাটায়। তারপর আল্লাহ্‌র হুকুমে একদিন দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয়। তাদেরকে আর কেউ মনে রাখে না। এটাই সাধারণ নিয়ম।

এই সাধারণ নিয়মের যে ব্যতিক্রম ঘটে না এমনটি নয়। মুসলিম জাহানে এমন লোক জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁরা অসাধারণ জ্ঞানী ও মহান। তাদেরকেই আমরা মনীষী বলে থাকি। ইসলামের ইতিহাসে তাঁদের অবদান অনেক। মুসলমান জাতির কাছে তারা স্মরণীয় ও বরণীয়। সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্মনীতি–সকল ক্ষেত্রেই তাঁদের আদর্শ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো অনুসরণযোগ্য। এমনি কয়েকজন নামকরা মুসলিম মনীষীর শিশুকাল থেকে শুরু করে কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্ববর্তী সময়ের কাহিনী নিয়ে রচনা করা হয়েছে 'মুসলিম মনীষীদের ছেলেবেলা' বইটি। আশা করি তাঁদের চারিত্রিক গুণাবলী ছোটদের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে সহায়ক হবে।

দক্ষিণ ধনিয়া
নূরপুর, ঢাকা
২০. ১. ১৯৮৮

হারুনুর রশিদ

মুসলিম মনীষীদের ছেলেবেলা

সূচী পত্র

নাম	পৃষ্ঠা
বড়ো ইমাম	১
মস্ত বড়ো জ্ঞানী	১৩
জ্ঞানের যুবরাজ	২২
বড়ো পীর	৩১
সবাই সুনাম করে	৪৩
মহান দার্শনিক	৪৯
চিকিৎসকের ছেলে বিজ্ঞানী	৫৫
মস্ত বড়ো এক ঐতিহাসিক	৬২

বড়ো ইমাম

ইরাক দেশ। অনেক অনেক দিন আগে দেশটাকে বলা হতো মেসোপটেমিয়া। দেশটির দু'পাশে দুটি নদী। নাম দজলা ও ফোরাত। নদীতে বড়ো বড়ো ঢেউ। ঢেউয়ের তালে তালে পাল তুলে চলে নৌকা।

দেশটি দেখতে অনেক সুন্দর। সেই দেশের একটি সুন্দর শহর কূফা। তখনকার দিনে কূফা ছিলো সে দেশের রাজধানী। শহরে সাবিত নামে এক লোক বাস করতেন। তাঁর ছিলো অনেক বড়ো ব্যবসা। দেশে বিদেশে সওদাগরী করতেন তিনি। অঢেল তাঁর টাকা-পয়সা। কিন্তু তিনি ছিলেন বড়ো পরহেজগার। কাউকে ঠকাতেন না। অযথা কোন জিনিসপত্রও মওজুদ করে দাম বাড়াতেন না। তাই সবাই তাঁকে ভালোবাসতো। সম্মান করতো। ভাবতো আপন মানুষ।

সেই যুগে ইরাকের বাদশারা ছিলেন খুবই প্রতাপশালী। তাঁরা ছিলেন উমাইয়া বংশের। সামরিক দিক থেকে তাঁরা ছিলেন বড়ো শক্তিশালী। খুব কম সময়ে অনেক দেশ জয় করে নেন তাঁরা। তাঁদের রাজ্য ছিলো অনেক বড়ো। সুদূর স্পেন পর্যন্ত ছিলো তাঁদের রাজ্যসীমা। কিন্তু তারা ছিল বিলাসী ও আরাম প্রিয়। তাই তাঁরা ছিলো খুবই দুর্বল। দেশের মধ্যে সুখ ছিলো না, শান্তি ছিলো না, ছিলো না আইন-শৃঙখলা। প্রায় সবখানেই বিরাজ করছিলো হিংসা বিদ্বেষ, অত্যাচার ও হানাহানি। তাঁরা ইসলামের নিয়মনীতি থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। তাঁরা ভুলে গিয়ে-

ছিলেন ইসলামের মহান শান্তির বাণী। ভুলে গিয়েছিলেন সাম্যের বাণী। ভুলে গিয়েছিলেন রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ)–এর প্রদর্শিত পথ। অন্যায় অবিচারে তাঁরা যেনো বর্বর হয়ে উঠলো!

আলিম সমাজ তাঁদের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগলেন। ফলে অনেক আলিম ও জ্ঞানী জনকে হত্যা করলো তাঁরা। ধর্মীয় শিক্ষা প্রায় বন্ধ। ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করার চেয়ে ব্যবসা করা অনেক ভালো। এতে টাকা পয়সা আসে আর কাজকর্মেরও স্বাধীনতা থাকে। সাবিতের স্ত্রীও পরহেজগার মহিলা। স্ত্রীর সাথে তিনি পরামর্শ করলেন, যদি তাঁদের ছেলে হয় তবে ছেলেকে একজন বড় ব্যবসায়ী বা সওদাগর বানাবেন। স্ত্রীও বললেন : তবে তাই হোক। আলিম হলে উমাইয়াদের কুনজরে পড়বে। ছেলেকে হারাবো, ব্যবসা হারাবো। সবই তো লুট করে নেবে ওরা।

৬৯৯ সাল। সেই কুফা শহরে একদিন সাবিতের স্ত্রীর কোল জুড়ে এলো এক ফুটফুটে ছেলে। ছেলেটি যেমন তেমন ছেলে নন! অনেক সুন্দর দেখতে তিনি। তাঁর চোখ দুটো ছিলো উজ্জ্বল। চমৎকার দেহের গড়ন। চঞ্চল শিশু নন। খুব শান্ত। ধীর স্থির। কণ্ঠস্বর উচ্চ। কথাগুলো মিষ্টি। ভাষা ছিলো পরিষ্কার ও সহজ।

বাপ–মা আদর করে ছেলেটির নাম রাখলেন নুমান। অনেক গুণের অধিকারী ছেলেটি। বড়ো হয়ে তিনি হন মস্ত বড়ো জ্ঞানী। তাঁর মতো জ্ঞানী দুনিয়ায় খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। জ্ঞান সাধনার দ্বারা তিনি মুসলিম জাতির অনেক উপকার করেছিলেন। এই অসামান্য শিশু মুসলিম জাহানে পরিচিত হন একজন বড়ো ইমাম হিসেবে। মুসলমানরা তাঁকে বলে ইমাম–ই–আযম।

সাবিতের মনে শান্তি নেই। দেশের আলিম সমাজের উপর অত্যাচার করা দেখে তিনি দুঃখিত হলেন। নুমানকে সাধারণ

ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তানের মতোই গড়ে তুলতে লাগলেন।

নুমানের লেখাপড়ায় মন নেই। তাঁর ইচ্ছা তিনি একজন বড়ো ব্যবসায়ী হবেন। তিনি পিতার কাছে শুনেছেন ব্যবসা করা হালাল। সুদ খুব খারাপ জিনিস। তাই তিনি সব সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা ভাবেন। ভাবেন কি করে বড়ো সওদাগার হবেন।

৭১৮ সাল। নুমানের বয়স যখন ১৮/১৯ তখন হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ (রঃ) শাহী তখতে আরোহণ করেন। তাঁর সময়ে সারা দেশে পুনরায় শান্তি ফিরে আসলো। তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের মতো সরল জীবন যাপন করতেন। খলীফাদের মতো নিজেকে তিনি সাধারণ মানুষ বলেই ভাবতেন। প্রিয় নবী (সঃ)-এর আদর্শকে তিনি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করলেন। ফলে ঘরে ঘরে কুরআন ও হাদীস শিক্ষা শুরু হতে লাগলো।

সেই সময়ের একটি চমৎকার ঘটনা। কূফা শহরের নামকরা আলিম শা'বী। তিনি নুমানকে প্রায়ই দেখেন কোথায় যেনো যাওয়া-আসা করে রোজ। তিনি ভাবতেন, এমন সুন্দর ছেলেটি কে? কোথায় যায় সে? কি কাজ তার? ছেলেটি কি পড়াশোনা করে, না কি ঘুরে বেড়ায়? কি তার পরিচয়? আহা। ছেলেটি যদি পড়াশোনা করতো হয়তো অনেক বড়ো হতো। কোথায় যাওয়া-আসা করে রোজ?

একদিন নুমান তাঁর বাড়ীর পাশ দিয়ে বাজারে যাচ্ছেন। শা'বীর সাথে তাঁর দেখা হয়ে গেলো। শা'বী ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ। ছলেটির চোখে মুখে বুদ্ধি আর প্রতিভার ছাপ। শা'বী জিজ্ঞেস করলেন,

ঃ তুমি কোথায় যাচ্ছ খোকা?

ঃ বাজারে যাচ্ছি, ছেলেটি বললো।

ঃ সেখানে কি করো তুমি?

ঃ ব্যবসা করি। আমাদের কাপড়ের ব্যবসা আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য করে আমি বড়ো সওদাগর হবো। সওদাগরী করলে দেশ-

বিদেশে ঘুরে বেড়াতে পারবো। শা'বী বললেন। তুমি কি লেখা-পড়া করো না? কোনো জ্ঞানী লোকের কাছে যাওয়া-আসা করো নাকি? নুমান বললেন ঃ না, আমি জ্ঞানীগুণীদের কাছে যাই না। তাঁদের কাছে যাওয়ার দরকারই বা কী? তাছাড়া আমার পিতার ইচ্ছা আমি ব্যবসায়ী হবো।

নুমানের কথা শুনে শা'বী হাসলেন। বললেন ঃ ব্যবসা করে টাকা কামাই করা যায়। কিন্তু বড়ো হওয়া যায় না। জ্ঞান ছাড়া বড়ো হয় না কেউ। ব্যবসা-বাণিজ্য সব সময়ই করতে পারবে। তোমার এখন লেখাপড়া করার সময়। জ্ঞানীগুণীদের কাছে তোমার যাওয়া উচিত। উচিত জ্ঞান সাধনা করা। আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার দ্বারা দুনিয়ার অনেক উপকার করাবেন। বাজারে যাচ্ছ যাও। যেতে যেতে আমার কথাগুলো ভেবে দেখো। আমি দোয়া করি, তুমি অনেক বড়ো হবে।

নুমান বাজারে যেতে যেতে ভাবতে লাগলেন। তিনি ভাব-লেন ঃ সত্যিই তো। জ্ঞান অর্জন করা ছাড়া মানুষ বড়ো হয় না। জ্ঞানেই মানুষ বড়ো হয়। জ্ঞান অর্জন করা ছাড়া আল্লাহ্ ও রসূলকে বোঝা যায় না। তিনি তখন থেকে লেখাপড়ার দিকে মন দিলেন। তাঁর পিতাও ছেলের আগ্রহ দেখে আর বাঁধা দিলেন না। নীরবে সম্মতি দিলেন। তখন থেকে ব্যবসা করার জন্য এতো বেশী বাজারে যাওয়া-আসা তিনি করেন না। আর শহরের বড়ো বড়ো জ্ঞানীর কাছে যাওয়া শুরু করলেন তিনি। জ্ঞান সাধনায় তাঁর সময় কাটতে লাগলো।

তিনি ছিলেন খুবই ভালো ছাত্র। একবার যা শুনতেন কখনো তা ভুলতেন না। শিক্ষকদের কাছে তিনি ছিলেন খুবই প্রিয় ছাত্র। পড়া-শোনায় ছিলেন অনেক মনোযোগী। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু শিখে ফেলতেন। তাঁর সংগের ছাত্ররা সাত দিনে যতোটুকু পড়াশোনা করতো, নুমান দু' একদিনেই তা শিখে ফেলতেন।

তখনকার দিনের পড়াশোনার নিয়ম অনুযায়ী নুমান ছাত্রদের পিছনে বসতেন। শিক্ষক যখন তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেলেন তখন তাঁকে সবার সামনে বসার আদেশ দিলেন। ভালো ছাত্ররা সামনে বসার অনুমতি পায়। নুমান যখন শিক্ষকের কাছে পড়ার সবক নিতেন তখন তিনি দুনিয়ার সব কিছুকে ভুলে যেতেন।

বর্তমানে বিদ্যালয়ে মানুষের লিখে যাওয়া জ্ঞানের কথা পড়ানো হয়। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যা লিখেছেন তা পড়তে দেওয়া হয়। নুমান যখন শিক্ষা লাভ করেছেন তখন প্রচলিত ছিলো অন্য রকম নিয়ম কানুন। তখন শিক্ষা বলতে কুরআন ও হাদীস শিক্ষা-কেই বোঝাতো।

কুরআন কি?

কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম মুসলমানদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ। এতে সারা দুনিয়ার জ্ঞান রয়েছে। এমন কোন জ্ঞানের বিষয় নেই, যা কুরআন শরীফে নেই। মানুষ কিভাবে আল্লাহ্‌কে চিনবে, এতে লেখা আছে সেসব কথা। দুনিয়ার পরিচয়, আকাশ, মাটি ও সাগরের নীচেকার রহস্য, সব কিছু রয়েছে কুরআন শরীফে। এ ছাড়াও আছে আরো নানা জ্ঞানের আলোচনা।

হাদীস কি?

হাদীস, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাণী, ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জীবনে চলার নানা নিয়ম কানুন, আদেশ উপদেশ। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিবরণ।

ইসলামী নিয়মকে বলে শরীয়ত। শরীয়তের নানা রকম প্রশ্নের জবাব হাদীসে পাওয়া যায়। নুমান প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কুরআন হাদীস শিখতে শুরু করলেন। মাত্র কয়েক বছর বয়স তাঁর। পুরো কুরআন মুখস্থ করলেন তিনি। ফলে কুরআনে হাফিজ উপাধি লাভ করলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই তিনি হাদীস শিক্ষায় মনোযোগ দিলেন। তাঁর মনে অনেক আনন্দ। তিনি ফিকাহ্শাস্ত্রের উপর লেখাপড়া করবেন।

ফিকাহ্ কি?

ফিকাহ্ মানে আইনশাস্ত্র। জীবনের নানা ক্ষেত্রে যেসব আইন–কানুন মেনে চলা উচিত সেগুলোই হলো ফিকাহ্র বিষয়।

নুমান ভাবলেন। এজন্য তাঁকে নামকরা জ্ঞানীদের কাছে যেতে হবে। যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। তিনি বসে রইলেন না। আইন–কানুন শিক্ষার জন্য কূফার বড়ো জ্ঞানী হাম্মাদ বিন সুলাইমানের নিকট যাওয়া আসা শুরু করলেন। শুধু কি তাই? তিনি সাধ্যমতো তখনকার সকল জ্ঞানীর নিকট পড়লেন এবং ভালোভাবে আইন–কানুন শিখে নিলেন।

তাঁর উস্তাদ বললেন ঃ আমার কাছে যা কিছু শিখবার, তা সবই শিখে ফেলেছেন নুমান। তাঁর এখন চিন্তা ও গবেষণা করা দারকার।

চিন্তা ও গবেষণা করলে কি হয়?

এতে জ্ঞানের সীমা বাড়ে। সত্যকে জানা যায়। ভালো মন্দ বোঝা যায়। মানুষের উপকারে জ্ঞানের ব্যবহার করা যায়। ফলে জীবন হয় সুন্দর। জ্ঞান ছাড়া আল্লাহ্কে ঠিকমতো চেনা যায় না। ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

উস্তাদের ভবিষ্যত বাণী একদিন সত্যি হয়েছিলো। নুমান (রঃ) জ্ঞান সাধনার দ্বারা পরবর্তী কালে একজন বড়ো ইমাম হলেন। সারা মুসলিম জাহানের লোকেরা এখন তাঁকে চেনে। তাঁকে সম্মান দেখায়। বড়ো ইমাম হিসেবে স্বীকার করে।

মুসলমানদের চারজন ইমাম। ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম ইবেন হাম্বল (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ও ইমাম মালিক (রঃ)। এঁরা সবাই কুরআন হাদীস অনুসারে শরীয়তের নানা রকম

আইন কানুন তৈরী করেছেন।

প্রত্যেক ইমামই যখন কুরআন হাদীস অনুসারে আইন কানুন তৈরী করলেন তখন ইমাম চারজন হলেন কেন?

মুসলমানদের সব কিছুর মূল হচ্ছে কুরআন ও হাদীস। এ ব্যাপারে কেউ দু'রকম কথা বলেন নি। শরীয়তের প্রধান প্রধান নিয়ম কানুনের ব্যাপারে চারজন ইমামই একমত ছিলেন। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত—এগুলো সবাই মেনে নিয়েছেন। তবে শরী-য়তের ছোটখাটো নিয়ম সম্পর্কে চারজন ইমামই কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন। কিন্তু এ কথা সত্যি যে, কেউ কুরআন ও হাদীসের বাইরে কোন কথা বলেন নি। আর যাঁরা যেই ইমামকে মানবেন তাঁদেরকে সেই মাযহাবের লোক বলা হয়।

মাযহাব কি?

মাযহাব মানে দল বা অনুসারী।

নুমান (রঃ)-এর মতের অনুসারীদেরকে বলা হয় হানাফী।

মুসলমানদের কাছে তিনি বড়ো ইমাম বা ইমাম-ই-আযম। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ইমাম-ই-আযম নামেই পরিচিত—নুমান হিসেবে নয়। বাপ-মায়ের দেয়া আদরের নাম নুমান হচ্ছেন আমাদের ইমাম আবু হানিফা (রঃ)।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-র জ্ঞান সাধনা আর চরিত্রের জন্য সবাই তাঁকে ইজ্জত করে। সম্মান করে। এমন কি তাঁর উস্তাদগণও তাঁকে সম্মান করতেন। শুধু কি তাই? ছাত্র জীবনে ইমাম আবুহানিফা (রঃ) তাঁর উস্তাদের মন জয় করে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। ফলে ক্লাশে উস্তাদেরা তাঁর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতেন।

আবু হানিফা (রঃ) সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন, দামী কাপড়চোপড় পরতেন। তবে তা লোক দেখানোর জন্য নয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ঈমানের অংগ, তাই।

তিনি কাউকে দুশমন ভাবতেন না। কারো প্রতি তাঁর হিংসা ছিলো না। কাউকে গালমন্দ দিতেন না। কারো উপর জুলুম করতেন না। তাঁর কাছে কেউ আশ্রয় চাইলে আশ্রয় পেতো। ক্ষতি করলে তিনি তার বদলা নিতেন না—ক্ষমা করে দিতেন। মনে কোনো অহংকার ছিলো না। কাউকে কোন মন্দ কথা বলতেন না। তিনি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতেন, অন্য কারো উপর নয়।

সংসারে অনেক মানুষ আছে, তারা কেবল নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তারা নিজেরাই কেবল বড়ো হতে চায়। সুখে থাকতে চায়। প্রতিবেশী বা অন্যের কথা তারা ভাবে না। খোঁজ খবর নেয় না। তারা নিজেরাই পেট বোঝাই করে খায়। দামী দামী কাপড় পরে। খাদ্য বস্ত্রহীন মানুষগুলোর খোঁজ–খবর তারা রাখে না। কিন্তু আবু হানিফা (রঃ) এরকম নন। নিজের কথা তত ভাবেন না। কেবল অন্যের কথাই ভাবতেন বেশী। অন্যের দুঃখ–কষ্ট দূর করে তিনি আনন্দ পেতেন। নিজের খাবার গরীবদুঃখী মানুষের মুখে তুলে দিয়ে সুখী হতেন। সব সময় পাড়াপ্রতিবেশীর খোঁজখবর নিতেন। দুঃখ–কষ্ট দেখলে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতেন। প্রতি–বেশীর জন্য তাঁর দরদ ছিলো অনেক বেশী।

আবু হানিফা (রঃ) খুবই বিশ্বাসী ছিলেন। তখনকার লোকেরা তাঁকে খুব বিশ্বাস করতো। তাদের টাকা – কড়ি – সোনা – রূপা ইত্যাদি অনেক কিছু তাঁর কাছে আমানত রাখতো। জীবন গেলেও আবু হানিফা (রঃ) লোকদের আমানত নষ্ট করতেন না। খরচ করতেন না অন্যের টাকা–কড়ি। তিনি বলতেন ঃ আমানত রক্ষা করা জিহাদের চাইতেও বড়ো কাজ। আল্লাহ্ আমানত রক্ষা–কারীকে ভালোবাসেন।

আবু হানিফা (রঃ)–র ব্যবসা বাণিজ্য ছিলো অনেক বেশী। বিভিন্ন শহরে তাঁর অনেক চাকর ছিলো। বড়ো বড়ো ধনী সওদা–

গরের সাথে তাঁর কাজ করবার চলতো। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন হতো। ব্যবসা-বাণিজ্যেও তিনি ছিলেন খুবই সাবধান। একটা পয়সাও অবৈধভাব ব্যবসাতে ঢোকাতেন না।

তিনি যে খুবই সৎ ব্যবসা করতেন সে ব্যাপারে একটি ঘটনা বলছি।

একদিন তিনি হাফস্ বিন আবদুর রহমান নামে এক লোকের নিকট এক থান কাপড় পাঠিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন ঃ থানের কাপড়ে কিছুটা দোষ আছে। কাপড়গুলো বিক্রয়ের সময়ে ক্রেতাকে তা বলে দেবে। কিন্তু লোকটির সে কথা মনে থাকলো না। সে দরদাম ঠিক করে ক্রেতাকে কাপড় দিয়ে দিলো। পরে হিসেবের সময় তিনি হাফ্‌সকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ খারাপ কাপড়ের কথা ক্রেতাকে বলেছ কি? লোকটি বললো ঃ না আমি ভুলে গিয়েছিলাম। লোকটির কথা শুনে তিনি দুঃখ পেলেন। তখনি তিনি দেরী না করে সব কয়টি কাপড়ের মূল্য গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। এ সততার জন্য ব্যবসায়ে তাঁর লোকসান হয় নি। আরও অনেক অনেক উন্নতি হয়েছে তাঁর ব্যবসায়।

সমাজে যাদের অনেক টাকা পয়সা, তারা আরো অনেক টাকা পয়সা বাড়ানোর চেষ্টা করে, গর্ব করে বেশী। গরীব লোকদের ধনীরা দেখতে পারে না। আল্লাহ্‌র শোকরও আদায় করে না। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-র অনেক টাকা পয়সা ছিলো ; কিন্তু টাকা পয়সার গর্ব তাঁর ছিলো না। সরল, ভদ্র, নম্র, বিনয়ী ও ধৈর্যশীল ছিলেন তিনি। তিনি সারা জীবনে কারো মনে কষ্ট দেননি এবং কারো প্রতি খারাপ ব্যবহার করেন নি।

একদিন তিনি মসজিদে তাঁর ছাত্রদেরকে নিয়ে বসে আছেন। এমনি সময়ে একলোক এসে তাঁকে উদ্দেশ্য করে খারাপ কথাবার্তা বলতে লাগলো। তিনি লোকটির কথায় রাগান্বিত হলেন না। পরে তিনি পাঠ দান শেষ করে বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন। লোকটিও

তাঁর সাথে সাথে চললো আর তাঁকে বকাবকি করছিলো। বাড়ীর কাছে এসে তিনি তাকে বললেন ঃ ভাই! তোমার গালমন্দ করা আরও কিছু যদি থাকে তবে দিয়ে দাও। এটা আমার বাড়ী। বাড়ীর মধ্যে গেলে তখন আর তুমি সুযোগ পাবে না।

প্রতিবেশীদের প্রতি তাঁর ব্যবহার ছিলো খুবই সুন্দর। প্রতিবেশীদের সাথে তিনি যে উদার ব্যবহার করতেন তার উদাহরণ খুবই কম মেলে।

মনীষীরা বলে থাকেন যে, যুদ্ধের মাঠে যাকে ভয়ে কিছু করতে না পারো, ভালোবাসা দিয়ে তাকে জয় করো। লোহার শিকল দিয়ে যাকে বাধতে না পারো, ভালবাসার শিকল দিয়ে তাকে বাধো। পরকে আপন করতে হলে তার মনের রাজ্যে সিংহাসন স্থাপন করতে হয়। শাসন করতে হলে সোহাগ করতে হয়। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-কে এসব কথা কারোও বলে দিতে হয় নি। ছোটবেলা থেকেই তিনি এসব গুণের অধিকারী ছিলেন।

একদিনের একটি ঘটনা।

তাঁর মহল্লায় বাস করতো এক মুচি। মুচির বাড়ী তাঁর বাড়ীর পাশেই। খুবই মেজাজী ও বদস্বভাবের ছিলো মুচি। বখাটে ছেলেদের সাথে আড্ডা দেওয়া, হৈ চৈ করা, মদ খাওয়া, গান-বাজনা করা— এসব ছিলো তার অভ্যাস। প্রতিবেশীরা তার অত্যাচারে খুবই কষ্ট পেতো। তারা ঘুমুতে পারতো না এবং কিছু বললেও মুচি বেটা মানতো না।

ইমাম আবু হানিফা খুব কম সময় ঘুমোতেন। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকে তিনি নামায পড়তেন। কুরআন তিলাওয়াত করতেন। মুচি বেটার হৈ হট্টগোলে আবু হানিফা (রঃ)-র কষ্ট হতো খুবই বেশী। কিন্তু তিনি তাকে কিছুই বলতেন না।

একদিন মুচি বাজার থেকে গোশ্‌ত ও মদ নিয়ে এলো। একটু রাত হতেই তার আড্ডাবাজ বন্ধুরা এসে হাজির হলো।

মুচি নিজ হাতে বড়ো বড়ো কাবাব তৈরী করে তাদেরকে খাওয়ালো এবং সে নিজেও খেলো। সকলে মিলে মদ পান করে হৈ হট্টগোল করতে লাগলো। তাদের হৈ হট্টগোল চললো। রাত গভীর হলো। রাতের পাহারাদাররা পাহারার কাজে বের হলো। একদল পাহারাদার ঘুরতে ঘুরতে মুচির বাড়ীর নিকটে এসে পড়লো। রাস্তার উপর থেকে তারা শুনলো বাড়ীতে খুবই হট্টগোল হচ্ছে। ঘরের ভিতর ঢুকে পাহারাদাররা মুচিকে গ্রেফতার করে জেলখানায় নিয়ে গেলো। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) তখনও জেগেই ছিলেন। তাঁর দরদী মন মুচির খবর নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সকাল বেলায় বন্ধু-বান্ধবদেরকে তিনি ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললো ঃ মুচিকে পাহারাদাররা ধরে নিয়ে গেছে। সে এখন জেলখানায়। এ কথা শুনেই তিনি রাজদরবারে যাওয়ার উপযুক্ত পোষাক পরিধান করলেন এবং রাজ দরবারের দিকে রওয়ানা হলেন।

তাঁকে দেখে বাদশাহ্ খুবই খুশী হলেন। বাদশাহ্ জানতেন তিনি সত্যবাদী— তিনি মিথ্যা কথা বলেন না। অন্যায় পথে চলেন না। বাদশাহ তাঁকে নিজের পাশে বসালেন এবং দরবারে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ আমার মহল্লায় এক মুচিকে আপনার পাহারাদাররা গ্রেফতার করে জেলে রেখেছে। অনুগ্রহ করে তাকে যদি মুক্তি দেন তাহলে আমি খুশি হবো।

বাদশাহ্ একথা শুনে আর বিলম্ব করলেন না। তখনই মুচিকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য জেল দারোগাকে আদেশ করলেন। জেল দারোগা মুচিকে ছেড়ে দিলো। তিনি দরবার থেকে বিদায় নিয়ে মুচিকে সাথে করে যাত্রা করলেন। সবাই তো দেখে অবাক যে, তিনি মুচিকে নিজের পাশে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। চলার পথে তিনি মুচিকে বললেন ঃ কি ভাই! তুমি কি আর মদ খাবে? মুচি বললো ঃ না। আপনি সত্যি প্রতিবেশীর হক আদায় করেছেন।

সেই দিনের এই ঘটনার পর হতে মুচি তওবা করলেন সে আর মদ পান করবে না। বাজে আড্ডা দেবে না। রঙ তামাসা করে টাকা খরচ করবে না।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)–র মন ছিলো খুবই কোমল। কারও কষ্ট দেখলে তিনি নিজে কষ্ট পেতেন। কারও দুঃখ দেখলে তিনি দুঃখিত হতেন। কারও বিপদে তিনি বসে থাকতে পারতেন না। অন্যের কষ্টে তাঁর মন কেঁদে উঠতো।

একদিন তিনি মসজিদে বসে আছেন। তখন এক লোক এসে খবর দিলো দালানের ছাদ হতে একজন লোক পড়ে গেছে। খবরটা শোনামাত্রই তিনি খুব জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলেন। সমস্ত মসজিদ কেঁপে উঠলো। তিনি মসজিদ থেকে খালি পায়ে দৌড়ে বের হলেন, হাঁপাতে হাঁপাতে আহত লোকটির কাছে আসলেন। লোকটিকে তিনি সান্তনা দিলেন, সেবা করলেন, সমবেদনা প্রকাশ করলেন। যতদিন না লোকটি ভাল হয়ে উঠলো ততদিন তিনি রোজ ভোরে গিয়ে লোকটিকে দেখে আসতেন।

বড়ো হয়ে তিনি সত্যের জন্য সংগ্রাম করেছেন অনেক। সত্যের জন্য এই সংগ্রাম করা অনেকের সহ্য হলো না। তাই তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। তিনি সত্যের জন্য সংগ্রাম করে শাহাদাত লাভ করলেন।

বড়ো হয়ে জ্ঞান সাধনার দ্বারা তিনি হলেন মুসলমানদের বড়ো ইমাম বা ইমাম–ই–আজম।

মস্ত বড়ো জ্ঞানী

সোভিয়েট রাশিয়া। বর্তমান বিশ্বের এক নাম করা দেশ। সেই দেশের একটি মুসলিম প্রদেশ উজবেকিস্তান।

অনেক অনেকদিন আগে উজবেকিস্তানকে বুখারা বলা হতো। বুখারা দেশটি ভারি সুন্দর। চারদিকে পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড়ের মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘরবাড়ী। খালি গায়ে লোকেরা চলাফেরা করতে পারে না। কারণ বার মাসেই সেখানে শীত থাকে। বুখারার পাশেই ইরান দেশ। সেই ইরান দেশের এক লোক, নাম তাঁর মুগীরা। তিনি ইরান ছেড়ে এসে বুখারা শহরে বসবাস করছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ আগুনের পুজো করতো। এক আল্লাহর প্রতি তাঁদের বিশ্বাস ছিলো না। মুসলমানরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করে। আগুন, পানি, বাতাসসহ দুনিয়ার সকল কিছুই তো এক আল্লাহ্র সৃষ্টি। মুগীরা তার পূর্বপুরুষদের মতো অগ্নি পুজো করতো। কিন্তু তিনি অগ্নি পূজো করলে কি হবে, এতে তাঁর বিশ্বাস ছিলো না। তিনি সৃষ্টিকর্তা নিয়ে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে তিনি মুসলমানদের ধর্মকে ঠিক মনে করলেন। সেই সময় বুখারার গভর্ণর ছিলেন মুসলমান। খুব ভালো লোক ছিলেন তিনি। ব্যবহার ছিলো তাঁর সুন্দর। মুগীরা গভর্ণরের কাছে গেলেন। গভর্ণ–রের ব্যবহারে তিনি উৎসাহ পেয়ে বললেন ঃ জনাব, আমি মুসলমান হবো। গভর্ণর এতে খুব খুশী হলেন। তাঁকে পাক পবিত্র করে 'কালেমা' পাঠ করালেন। গভর্ণরের নাম ছিলো য়ামানুল

জুফী। এভাবে কাটলো অনেক দিন। তারপর একদিন মুগীরার স্ত্রীর কোল জুড়ে আসলো একটি ফুটফুটে ছেলে। ছেলেটি খুবই সুন্দর। মাতাপিতা আদর করে নাম রাখলেন ইবরাহীম। খাঁটি মুসলমান রূপে বড় হয়ে উঠলেন তিনি। সৎভাবে ব্যবসা করতেন। লোকদেরকে ঠকাতেন না। খারাপ বা ভেজাল মাল বিক্রয় করতেন না। সৎভাবে ব্যবসা করে অনেক টাকা হলো তাঁর। এই ইবরাহীমের পুত্র ইসমাঈল নিজের সাধনায় জ্ঞানের শিখড়ে আরোহন করলেন, হলেন বিজ্ঞ মুহাদ্দিস ও একজন সৎ ব্যবসায়ী।

১৯৪ হিজরী সাল। ইসমাঈলের এক ছেলে জন্ম নিলো। নাম মুহাম্মদ। সুন্দর ফুটফুটে চাঁদের মতো তাঁর মুখ। এই ছেলেটিই বড়ো হয়ে মুসলিম জাহানে ইমাম বুখারী (রঃ) হিসেবে পরিচিত হন।

তাঁর জ্ঞান গুণ ছিলো অসাধারণ। হাদীস সংকলক হিসেবে তাঁর নাম দুনিয়াজোড়া। তিনি প্রায় ছয় লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন। ছয় লক্ষ হাদীসের মধ্যে দু'লক্ষ হাদীস ছিলো তাঁর মুখস্থ। এমন ছেলের সুনাম কে না করে বলো।

বুখারী (রঃ) যখন হাদীস সংগ্রহ করছিলেন সেই সময় আরও কয়েকজন মনীষী এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। হাদীস–শাস্ত্রের কথা বলতে গেলে তাঁদের কথাও বলতে হয়। তাঁরা হলেন ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসায়ী, ইমাম ইবনে মাজা, ইমাম তিরমিযি (রঃ)। হাদীস সংগ্রহকারীদের মধ্যে ইমাম বুখারী (রঃ) এবং এঁর পর পাঁচ জন হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। ইমাম বুখারী (রঃ) ও এই পাঁচজন মুহাদ্দিসের পর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ 'সিহাহ সিত্তা' নামে সুপরিচিত।

ইমাম বুখারী (রঃ)–এর হাদীস গ্রন্থখানি সকলের কাছে সহীহ্ বুখারী নামে পরিচিত। এ গ্রন্থ সংকলন করার সময় তিনি যে

নিয়ম পালন করেন তা শুনতেও অবাক লাগে! এ সম্পর্কে বুখারী (রঃ) নিজেই বলেন ঃ এক একটি হাদীস লেখার আগে আমি দু'রাকাত নফল নামায পড়ে মুনাজাত করেছি ঃ হে আল্লাহ্, আমি অজ্ঞ। আমার হৃদয়ে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দাও। হাদীস লেখায় আমি যেনো ভুল না করি!

এভাবে মুনাজাত করে তিনি মদীনায় অবস্থান কালে প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর কবরের পাশে বসে এক একটি হাদীস লিখতেন এবং লেখার পূর্বে গোসল করে নামায আদায় করতেন।

ইমাম বুখারী (রঃ) তখন খুব ছোট। তাঁর আব্বা মারা গেলেন। মা তাঁকে আদর দিয়ে লালন পালন করতে লাগলেন। দৈবক্রমে তাঁর চোখের জ্যোতি কমে যাচ্ছিলো। তা দেখে মায়ের দুঃখের অন্ত ছিলো না। মা ভাবে, হায়! সারাটা জীবন ছেলেটির কতই না কষ্ট হবে! অনেক বড়ো বড়ো হেকিম দেখানো হলো। কিন্তু কোন হেকিম তাঁকে ভালো করতে পারলেন না।

মা ছিলেন পরেহেজগার মহিলা। নামায পড়ে আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটি করলেন। আর ধৈর্য ধরে দোয়া করতে লাগলেন ঃ আল্লাহ্ যেনো ছেলেকে ভালো করে দেয়! আল্লাহ্ বড়ো দয়ালু। দুঃখিনী মায়ের দোয়া কবুল করলেন। এভাবে তাঁর মা একদিন ছেলের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন ইবরাহীম (আঃ) স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁকে বললেন ঃ হে পরহেজগার মহিলা, আপনার দুঃখ দূর হলো। আল্লাহ্ আপনার দোয়া কবুল করে তাঁর চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ভোরে ঘুম ভাঙার পর তিনি দেখলেন বুখারী (রঃ)-এর চোখের সমস্ত অন্ধত্ব দূর হয়ে গেছে। তিনি আল্লাহ্র শোকর আদায় করলেন।

দশ বছর তাঁর বয়স। বুখারী (রঃ) নিকটস্থ মক্তবে লেখাপড়া করতেন। সেই সময় হতে তিনি আলিমদের মুখে যে সব হাদীস শুনতেন সেসব মুখস্থ করে ফেলতেন।

তখনকার সময়ে শিক্ষার বিষয় ছিলো কুরআন ও হাদীস। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) যেভাবে যা বলছেন, তা হুবহু গ্রহণ করতে হবে। এটাই নিয়ম। কিন্তু তখন কোনো বই ছিলো না। কারণ বর্তমানের মতো কাগজ তখন ছিলো না। হাড়, চামড়া ও পাথরের উপর লিখে রাখতে হতো। তখন হাদীস বা নবী (সঃ)-র বাণী লিখে রাখা সম্ভব হতো না। যাঁরা শুনতেন তাঁরা মনে রাখতেন। এঁদেরকে সাহাবী বলা হয়। নবী (সঃ) ইনতি-কালের পর ধীরে ধীরে সাহাবীরা বয়োবৃদ্ধ হলেন। আবার অনেকে শহীদ হলেন। মুসলমানরা তখন কুরআন ও হাদীসকে চিরকালের জন্য হিফাজত করতে চাইলেন, এ প্রয়োজনে কুরআন হাদীস সংগ্রহ শুরু হয়। কুরআন নির্ভুলভাবে সংগৃহীত হলো। কারণ অনেক সাহাবী কুরআনে হাফিজ ছিলেন। কিন্তু হাদীস সংগ্রহের বেলায় সমস্যা দেখা দিলো। নবী (সঃ) কোন সময় কার কাছে কি বলেছেন তা একত্রে জড়ো করা এবং নির্ভুলভাবে সেগুলো হুবহু বর্ণনা করা সহজ ছিলো না।

জ্ঞানী লোকেরা হাদীস পড়াশোনা করতো। তাঁরা শুধুমাত্র লোকদের মুখে হাদীস শুনতেন না, লোকটি কেমন সে খোঁজও নিতেন। বুখারী (রঃ) সে জ্ঞানীদের মধ্যে নাম করা একজন ছিলেন। হাদীস পড়াশোনায় তাঁর জ্ঞান ছিলো অগাধ। কিছু দিনের মধ্যে বুখারী (রঃ) মক্তবের পড়া শেষ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই এই বালকের সে সাধ পুরো হতে চললো। আল্লামা দাখেলী তখন বুখারার সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি। মায়ের অনুমতি নিয়ে বুখারী (রঃ) আল্লামা দাখেলীর খিদমতে

শাগরিদ হওয়ার জন্য আরজি পেশ করলেন। আল্লামা দাখেলী এ জ্ঞানী বালককে আনন্দের সাথে শাগরিদভুক্ত করে নিলেন। এর মধ্যে একদিন একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেলো। ক্লাশে পড়াবার সময় আল্লামা দাখেলী একটি হাদীসের সনদে ভুল করে বসলেন। বুখারী (রঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, "জনাব, ওখানে আপনার ভুল হয়েছে।" কথা শুনে শিক্ষকের রাগ হচ্ছিল। পরে হাদীস গ্রন্থ বের করে দেখলেন বুখারী (রঃ) ঠিকই বলেছেন। আসলে তিনিই ভুল বলেছেন। এতে দাখেলী খুশী হলেন। বালক বুখারী (রঃ)-এর মেধাশক্তির প্রশংসা করে তাঁর ভবিষ্যত সম্বন্ধে খোশখবরী দিলেন। মক্কা, মদীনাসহ মুসলিম দুনিয়ার বড়ো বড়ো শহর ঘুরে এসে বুখারী (রঃ) ষোল বছর বয়সেই হাদীসের সকল কেতাব মুখস্থ করে ফেললেন।

একদিনের একটি সুন্দর ঘটনা। বালক বুখারী (রঃ)-র সহ-পাঠী হামিদ বিন্ ইসমাইল বললেন ঃ বুখারী, তুমি কাগজ কলন নিয়ে ক্লাসে আসো না। উস্তাদের শিক্ষণীয় বিষয় কি করে তুমি মনে রাখবে? তখন বুখারী (রঃ) উত্তর দিলেন ঃ তবে শোনো বন্ধুগণ, তোমাদের লেখার সাথে আমার স্মরণ শক্তির প্রতি-যোগিতা হোক। বন্ধুরা বুখারী (রঃ)-র কথায় রাজী হলো। বন্ধুরা তাদের বহু দিনের লেখা পনের হাজার হাদীসের খাতা সামনে রাখলো। বালক বুখারী (রঃ) এক এক করে পনের হাজার হাদীস অনর্গল মুখস্থ বলে দিলেন। এ স্মরণ শক্তি দেখে বন্ধুরা আশ্চর্য হলো। বুখারী (রঃ)-র ব্যক্তিত্বের নিকট বন্ধুদের মস্তক ভক্তিতে নত হয়ে পড়লো।

বালক বুখারী (রঃ) অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন মানব দরদী। মানুষকে তিনি মনে প্রাণে ভালোবাসতেন। তাদের সুখ-দুঃখে তাঁর হৃদয় ব্যথিত হতো। মানুষের কল্যাণ

সাধনে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তাঁর জন্য নিজকে অশেষ কষ্ট স্বীকার করতে হলেও তিনি কিছু মাত্র কুণ্ঠা বোধ করতেন না।

শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন আল্লাহ্ ভক্ত এক মহান বালক। আল্লাহ্র ধ্যান ছিলো তাঁর জীবনের পরম সাধনা।

বুখারী (রঃ) চিরকালের এক বিরল প্রতিভা। যুগে যুগে তাঁর মতো এমন প্রতিভাবান ব্যক্তি খুব কমই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের মাঝে চিরকাল বেঁচে থাকবেন। বেঁচে থাকবেন মস্ত বড়ো জ্ঞানী হিসেবে।

বুখারী (রঃ)–র আব্বা অনেক অনেক ধনসম্পদ রেখে ইন্–তিকাল করেছিলেন। তিনি এসব ধনসম্পদ ব্যবসায়ে লাগাতেন। কিন্তু জ্ঞান সাধনায় ডুবে থাকতেন বলে তিনি বিভিন্ন লোকদের মারফতে ব্যবসা চালাতেন। তবে তিনি কর্মচারীদের কাজকর্মের দিকে খুব খেয়াল রাখতেন। তাঁর দ্বারা যেনো কোন লোক না ঠকে সেদিকেও নজর রাখতেন। বেশী দামের জিনিসের সাথে কম দামের জিনিস মিশিয়ে বেশী দামে বিক্রি করা বা খারাপ জিনিসকে ভালো বলে চালানো এসব কাজ যাতে কর্মচারীরা না করতে পারে সেদিকেও খেয়াল রাখতেন তিনি।

বুখারী (রঃ)–র মন ছিলো খুবই উদার। কোন লোক তাঁর ক্ষতি করলেও তার বদলা তিনি নিতে চাইতেন না।

একদিন তাঁর ব্যবসায়ের এক অংশীদার তাঁর পঁচিশ হাজার দেরহাম নিয়ে পালিয়ে গেলো। লোকটি কোন্ জায়গায় লুকিয়ে আছে ইমাম বুখারী (রঃ)–কে তা জানানো হলো এবং লোকটিকে পাকড়াও করার জন্য বলা হলো। কিন্তু ইমাম বুখারী (রঃ) এতে রাজি হলেন না। এজন্য সেখানকার গভর্ণরকে অনুরোধ জানাতে হবে। হয়তো তাঁর কাজ হাসিল হবে। কিন্তু গভর্ণর এই উপকারের বদলায় তাঁর দ্বারা কোন অন্যায় কাজও করিয় নেবার সুযোগ খুঁজতে পারেন। বুখারী (রঃ)–র বন্ধুরা তাঁর অগোচরেই পলাতক

লোকটিকে ধরার ব্যবস্থা করলেন। একথা জানতে পেরে বুখারী (রঃ) খুব রেগে গেলেন। তিনি দেরী না করে বন্ধুদেরকে জানিয়ে দিলেন তারা যেনো লোকটির সাথে কোনরূপ খারাপ ব্যবহার না করে।

ঘটনাক্রমে সেখানকার গভর্ণর ঘটনাটি জানতে পারলেন। গভর্ণর লোকটিকে ধরে আটকিয়ে রাখলেন আর পঁচিশ হাজার দেরহাম জরিমানা করলেন। ইমাম বুখারী (রঃ) খবর পেয়ে দুঃখিত হলেন। তিনি লোকটিকে বাঁচানোর কথা ভাবলেন। গভর্ণরের কাছে গিয়ে একটি শর্তে তিনি তা মীমাংসা করলেন। লোকটির জরিমানা পঁচিশ হাজার দেরহামের বছর বছর মাত্র দশ দেরহাম করে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু দুষ্ট লোকটি বুখারী (রঃ)–র একটি দেরহামও আর ফেরত দিলো না। এভাবে বুখারী (রঃ) নিজের ক্ষতি করেও পরের উপকার করতেন।

বুখারী (রঃ) ব্যবসা করে যে টাকা আয় করতেন তা শুধু নিজের কাজে খরচ করতেন না বরং আয়ের বেশীর ভাগ টাকা তিনি গরীব, ফকির ও দুঃখীদের মধ্যে দান করে দিতেন। সাধারণ খাওয়া–দাওয়া করে বুখারী (রঃ) খুশী থাকতেন। কোন রকম বিলা–সিতা করা তিনি পছন্দ করতেন না। বুখারী (রঃ) আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবীদের মত পাক পবিত্র জীবন যাপন করতে ভালোবাসতেন।

আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) মানুষকে বলেছেন চাকরবাকর–দের সাথে ভালো ব্যবহার করতে। বুখারী (রঃ)–র বাড়ীতেও চাকরবারক ছিলো। একদিন বুখারী (রঃ) ঘরে বসে আছেন। তাঁর পাশেই ছিলো একটি কালির দোয়াত। ঘরের এক দাসী তাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, অসাবধানে চলাতে তার পা লেগে কালির দোয়াত উল্টে পড়ে গেলো। পড়া মাত্রই কালি চারদিকে ছিটিয়ে পড়লো।

এতে কার না রাগ হয়! কিন্তু বুখারী (রঃ) রাগ সংযত করে বললেন ঃ তুমি ঠিকমত হাঁটতে পারে না? দাসী বেআদবের মত জবাব দিলো ঃ পথ না থাকলে আমি কি করে চলবো?

অন্য কেউ হলে হয়ত রাগে দাসীকে মারধর করতো। কিন্তু বুখারী (রঃ) তাতেও রাগ না করে দাসীকে বললেন ঃ যাও, তোমাকে আযাদ করে দিলাম। অথচ তাঁর দাসীকে তিনি মারধর করলেও কেউ কিছু বলতে পারতো না। বুখারী (রঃ) দাসীর সাথে এত সুন্দর ব্যবহার করতে দেখে তাঁর পাশে বসা এক ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ দাসী অন্যায় করলো, তাকে শাস্তি না দিয়ে আপনি তাকে মুক্তি দিলেন, এটা কি রকম ব্যাপার? বুখারী (রঃ) জবাব দিলেন ঃ আমি আমার মনকে এ ব্যাপারে রাজী করালাম।

কারো আড়ালে কারো দোষের কথা বলার নাম গীবত। গীবত করা ইসলামে নিষেধ। একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে বুখারী (রঃ) কখনো কারো গীবত করতেন না। এরূপ সামান্য অন্যায় হলেও তিনি অনুতপ্ত হতেন।

একদিন এক অন্ধ লোকের কাছে তিনি মাফ চাইলেন। অন্ধ লোকটি কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে জানতে চাইলো ব্যাপারটি কি! তখন বুখারী (রঃ) বললেন ঃ একদিন আপনি খুব খুশী মনে হাত ও মাথা দুলিয়ে কথা বলছিলেন। আপনার হাত ও মাথা নাড়ার ভংগী দেখে আমার খুব হাসি পাচ্ছিলো। এজন্যই আমি অনুতপ্ত হয়ে আপনার কাছে মাফ চাচ্ছি। অন্ধ লোকটি খুশি হয়ে বললো ঃ না এ তেমন কিছু নয়। আমি মাফ করে দিলাম।

নিজের কাজ নিজে করলে সম্মান কমে না। বুখারী (রঃ) নিজের কাজ নিজেই করতেন। সে সব কাজ নিজের পক্ষে করা সম্ভব তা করতে অন্য কারো সাহায্য নিতে চাইতেন না।

সারা বিশ্বের মধ্যে যে ক'জন জ্ঞানী-গুণী লোক কাজ কর্মে খাঁটি মানুষ হিসেবে পরিচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বুখারী (রঃ) ছিলেন অন্যতম। প্রিয় নবী (সঃ)-র কথাগুলো তিনি যেমন মুখস্থ রাখতেন তেমনি সেই কথামত চলতেন। ইসলামের নিয়ম-নীতির বাইরে তিনি কিছুই করতেন না। কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান সাধনার জন্যই তিনি জীবনে মস্ত বড়ো জ্ঞানীর সম্মান লাভ করেছেন। মুসলিম জাহানে তিনি বেঁচে থাকবেন মস্ত বড়ো জ্ঞানী হিসেবে। ২৫৬ হিজরী ঈদুল ফিতরের দিনে তিনি ইন্তিকাল করেন। ঈদের দিন যোহরের সময় সমরকন্দের খরতংগ গ্রামে তাঁকে দাফন করা হয়। দুনিয়ার বুকে প্রায় বাষট্টি বছর বেঁচে ছিলেন এই জ্ঞানবীর। কোটি কোটি মানুষ এই মহাজ্ঞানীর জন্য চোখের পানি ফেলে। পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ এই জ্ঞানীর নাম ইমাম বুখারী (রঃ)। যার লেখা হাদীস বোখারী শরীফ আজ পৃথিবী বিখ্যাত।

জ্ঞানের যুবরাজ

"দেহ ভাগ হলেও আত্মার যেমন ভাগ হয় না, তেমনি দেহের ধ্বংসের সাথে সাথে আত্মা ধ্বংস হয় না— আত্মা অক্ষয়, তার ধ্বংস নেই। জন্ম-মৃত্যু ও সুখ-দুঃখের উপর মানুষের কোন হাত নেই। মানুষ তার ভাগ্যের অধীন। আর সে ভাগ্যকে পরিচালনা করেন এক আল্লাহ্।"

আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগেকার কথা। এ মহাসত্যের উপর গবেষণা করেছেন এক মুসলিম মনীষী। তিনি একাধারে দর্শন, গণিত, জ্যামিতি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান সাধনা করে মুসলিম জাতির অনেক উপকার করেছেন। এতো গুণের সমাহার একজন মানুষের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়।

শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন নামকরা একজন চিকিৎসক। জটিল ও কঠিন রোগের চিকিৎসায় তাঁর কৃতিত্ব সত্যিই অবাক হবার মতো! চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর লেখা 'আলকানুন' একটি অমূল্য কিতাব। এতে সাত শত ষাটটি ঔষধের বিবরণ রয়েছে; আলোচনা করা হয়েছে অনেক অনেক কঠিন রোগের কারণ ও চিকিৎসার নিয়ম কানুন। তখনকার সময়ে এমনটি আর কেউ করতে পারেন নি যার জন্য ইউরোপের চিকিৎসা বিদ্যালয়গুলোতে এই কিতাবটি পাঠ্য ছিলো। সকল ভাষার লোকেরা যাতে কিতাবটি পড়তে পারে, সেজন্য ইংরেজী, ফরাসী, ল্যাটিন,

হিব্রুসহ নানা ভাষায় কিতাবটি অনুবাদ করা হয়।

তখনকার দিনে মুসলমানরাই ছিলো দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি। রাজ্য জয় বা শারীরিক শক্তি খাটিয়ে তারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন নি। শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্যই ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

বর্তমানের জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীরা মুসলমান জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের লিখে যাওয়া গ্রন্থরাজির উপর গবেষণা করে নিজেদেরকে বড়ো করতে পেরেছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষা তারা মুসলমান-দের নিকট থেকেই লাভ করেছিলো।

সেই সময়ে মুসলমানদের মধ্যে বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ রসায়নবিজ্ঞানী, কেউ পদার্থবিজ্ঞানী, কেউ চিকিৎসা বিজ্ঞানী, কেউ দার্শনিক, কেউ বা ঐতিহাসিক। এমনি আরো কত কি হয়েছেন তাঁরা। ইবনে সীনা, ইবনে খালদুন, ইবনে রুশ্‌দ, আলগায্‌যালী (রঃ), আল রাযী- এঁদের নাম দুনিয়ার সবাই জানে। সবাই চেনে। সুনাম করে।

ইবনে সীনা মুসলিম মনীষীদের মধ্যে নামকরা একজন বিজ্ঞানী। তিনি সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন। তা ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন দক্ষ লেখক ও বিজ্ঞ চিকিৎসক।

৯৮০ সালের এক শুভ দিনে মুসলিম জাহানের অন্যতম মনীষী ইবনে সীনা জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতা পুত্রের নাম রাখেন আবু আলী হোসেন ইবনে সীনা। পরে তিনি শুধু ইবনে সীনা নামেই সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। ইবনে সীনা যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তার নাম 'আফসালা'। তূর্কীস্তানের নাম করা শহর বুখারা। সেই শহরের নিকটে সেই ছোট গ্রাম আফসালা। তাঁর বাবার নাম আবদুল্লাহ্ এবং মাতার নাম সেতারা বিবি। বাবা বুখারার শাসনকর্তার দেওয়ানের কাজ করতেন।

ইবনে সীনার ছেলেবেলা বুখারা শহরেই কাটে। পাহাড়

ঘেরা বুখারার মনোরম পরিবেশে বালক ইবনে সীনা ধীরে ধীরে লালিত পালিত হতে থাকেন। বাবা ছিলেন গরীব। কিন্তু তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি ছিলো অনেক। জ্ঞান সাধনাতে অনেক আগ্রহ ছিলো তাঁর। সব সময় তাঁর ঘরে জ্ঞানের বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। বুযর্গ আলিম ও বড়ো বড়ো পণ্ডিত লোক কুরআন হাদীস নিয়ে আলোচনার জন্য তাঁর কাছে আসতেন। ধর্মের নানা বিষয় তাঁরা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতেন বালক ইবনে সীনা তাঁর বাবার পাশে বসে গভীর আগ্রহ সহকারে তা শুনতেন। দেখতে দেখতে বাবার পাশে থেকে অল্প বয়সেই দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতির উপর তিনি অনেক জ্ঞান লাভ করলেন। পিতা আবদুল্লাহ্ খুব যত্ন ও আদরের সাথে ইবনে সীনাকে লালন পালন করতে লাগলেন। তিনি ইবনে সীনার মধ্যে মেধা আর প্রতিভার বীজ লুকিয়ে রয়েছে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি পুত্রের প্রতিভা বিকাশের ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান হলেন। তাঁর জন্য উত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর গুণাবলী যাতে বিকশিত হতে পারে সেজন্য তিনি শিক্ষক রেখে তাঁকে তালিম দিতে লাগলেন।

বয়স তাঁর পাঁচ বছর। গৃহ শিক্ষকের নিকট ইবনে সীনার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। শৈশব কাল থেকেই লেখাপড়ায় তিনি ছিলেন খুবই মনোযোগী। কিছু দিনের মধ্যে তিনি অনেক কিছু শিখে ফেললেন। গৃহ শিক্ষক তাঁর আসমান্য প্রতিভার প্রশংসা করলেন।

দশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার আগেই তিনি হলেন কুরআনে হাফিজ। পুরো কুরআন শরীফ মুখস্থ করা ছাড়াও কুরআনের অর্থ কি ও কেন এবং কোথায়, তা জানার চেষ্টা করতেন তিনি। তাঁর চিন্তা শক্তি ছিলো অত্যন্ত তীক্ষ্ম। যখন যে বিষয়ে পড়াশোনা করতেন তা শেষ না করে অবসর নিতেন না। অতি অল্প বয়সেই

নাম করা জ্ঞানী হিসেবে তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর প্রতিভার কথা জানতে পেরে লোকেরা তাঁকে হাফিজ উপাধি দিলো। হাফিজ অর্থ জ্ঞানী।

আল নাতিলি তখনকার নাম করা শিক্ষক। বালক ইবনে সীনা তাঁর কাছে লেখাপড়া শিখতেন। শিক্ষক বলতেন ঃ ইবনে সীনার শিক্ষকতা করতে গিয়ে আমি যে আনন্দ পেলাম তা আর কোথাও পাইনি। নাতিলি ইবনে সীনার আব্বা হুযুরকে ডেকে বললেন ঃ দেখবেন আপনার ছেলে একদিন দুনিয়ার একজন সেরা জ্ঞানী হবে। ওর লেখা পড়ায় যেনো কোন অবহেলা না করা হয়।

ইবনে সীনার শৈশব জীবন খুবই সুন্দর ছিলো। জীবনের সব কিছুকেই তিনি সহজভাবে গ্রহণ করছিলেন। যা পেতেন তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। অসম্ভব কিছু পাওয়ার প্রতি তাঁর লোভ ছিলো না। জাঁকজমক বা আড়ম্বরের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিলো না। তিনি ছিলেন মানবদরদী। মানুষকে তিনি নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসতেন। মানুষের দুঃখে তাঁর হৃদয় হতো ব্যথিত।

শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন আল্লাহভক্ত। আল্লাহর ধ্যান ছিলো তাঁর জীবনের পরম সাধনা। তাই তো আল্লাহ্ তাঁকে অ-সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী করেছেন।

বালক ইবনে সীনা শিক্ষকদের কাছে নানা রকম প্রশ্ন করতেন। উত্তরও পেতেন। কিন্তু শিক্ষকের উত্তরে তিনি সুষ্ট হতে পারতেন না। নতুন নতুন জিজ্ঞাসায় তাঁর আগ্রহ আরো বেড়ো যেতো। নামায পড়ে তিনি আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত করে বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি জ্ঞানের দুয়ার খুলে দাও। সমস্যা সমাধানের পথ দেখাও। আরও সহজ করে দাও। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা দাও। আমার অন্তরকে খুলে দাও।

এতো অল্প বয়সেই তিনি বুঝতে পারলেন, আল্লাহ্র কাছে না চাইলে কোন কিছু পাওয়া যায় না। তাঁর কাছে কোনো কিছুর অভাব নেই। চাইলে তিনি কাউকে ফিরিয়ে দেন না। তিনি সর্বশক্তিমান। সব কিছু দানকারী।

তাই তো ইবনে সীনার সকল চাওয়া পাওয়া ছিলো এক আল্লাহ্র কাছে।

মাত্র ষোল বছর বয়সে ইবনে সীনা হলেন চিকিৎসক। নামকরা চিকিৎসক। দেশ বিদেশ থেকে বহু চিকিৎসক তাঁর কাছে চিকিৎসাশাস্ত্র ও তাঁর আবিষ্কৃত চিকিৎসা প্রণালী শিক্ষা করতে আসতেন।

বুখারার বাদশাহ্র এক কঠিন রোগ হলো। দেশ বিদেশের নামকরা হেকিমদেরকে ডাকলেন তিনি। তাঁরা বাদশার চিকিৎসা করলেন। কিন্তু রোগ ভালো হলো না। দিনে দিনে বাদশাহ্র অবস্থা খারাপ হয়ে পড়লো। অবশেষে বাদশার লোকেরা ইবনে সীনাকে ডেকে আনলেন। তিনি বাদশাকে ভালভাবে পরীক্ষা করে বললেন তাঁর রোগ ভালো হবে; চিন্তার কোন কারণ নেই। বাদশার লোকেরা তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারলো না। কিন্তু ইবনে সীনা ঔষধ দিলেন এবং বাদশাহ অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেন। এ ঘটনার পর সবাই তাঁর সুনাম করতে লাগলো। বাদশার কাছেও তাঁর অনেক কদর হলো। বাদশা তাঁকে অনেক আদর যত্ন করলেন। তিনি ইবনে সীনাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনাকে কি দিলে আপনি খুশী হবেন? যা কিছু চাইবেন তা-ই দেওয়া হবে।

তিনি ইচ্ছা করলেই বাদশাহের কাছ থেকে উচ্চ রাজপদ, ধন সম্পদ লাভ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করলেন না। এ সবের প্রতি তাঁর লোভ ছিলো না। তিনি ছিলেন জ্ঞান সাধক। তাই তিনি জবাব দিলেন ঃ জাঁহাপনা, আমি রাজদরবারের

লাইব্রেরীতে পড়াশোনা করার অনুমতি চাই। অন্য কোন কিছুতে আমার প্রয়োজন নেই।

বাদশাহ্ অবাক হয়ে গেলেন।

জ্ঞানী লোকের যোগ্য জবাব বটে। বাদশাহ্ তাঁর কথায় খুশি হয়ে হুকুম দিলেন ঃ আজ থেকে রাজদরবারের লাইব্রেরী আপনার জন্য সব সময় খোলা থাকবে।

লাইব্রেরীতে প্রবেশ করে ইবনে সীনা দেখতে পেলেন সেখানে জ্ঞানের অনেক অনেক বই। তাঁর মন খুশীতে ভরে গেলো। তাঁর মন এতো খুশী হলো যে, দুনিয়ার ধনসম্পদে ভরে দিলেও তিনি এতো খুশী হতেন না। ইবনে সীনা এ সময় এতো পড়াশোনা করতেন যে, দিবারাত্রের মধ্যে একটুও ঘুমাতেন না।

একটি মজার ঘটনা। এক সময় ইস্পাহানের শাহাজাদার এক অদ্ভুত রকমের রোগ দেখা দিলো। শাহাজাদা খাওয়া–দাওয়া ছেড়ে দিলো। সে দিনরাত শুধু চিৎকার করে বলতো ঃ আমি গরু, আমাকে জবাই করো, আমাকে জবাই করো। আমার গোশ্‌ত দিয়ে মজাদার কাবাব বানাও।

দেশের বড়ো বড়ো হেকিমকে দিয়ে তার চিকিৎসা চললো। কিন্তু কোন ফল হলো না। শাহাজাদার রোগ দিন দিন বেড়েই চললো। সে খাওয়া–দাওয়া একেবারেই ছেড়ে দিলো। এমন কি ঔষধ পর্যন্ত মুখে দিতো না। সবই ফেলে দিতো। আর সবাইকে বলতো তার কোন রোগ হয় নি। সে শুধু জবাই হতে চায়। এমন আজব রোগের কথা কেউ কোন দিন শোনে নি।

এদিকে না খেয়ে খেয়ে শাহাজাদা আধমরা হয়ে গেলো। খাওয়া নেই ঘুম নেই। কেবলই সে চিৎকার করে ঃ আমি গরু, আমাকে জবাই কর। অবশেষে সবাই ইবনে সীনার নিকট গেলো। তিনি লোকের মুখে সব কথা শুনে বললেন ঃ শাহাজাদাকে খুশির

খবর দাও যে, কসাই আসছে। তাকে জবাই করা হবে।

লোকেরা শাহাজাদাকে এ খবর শোনালো। খবর শুনে শাহা-জাদা খুব খুশি হলো। কিছুক্ষণ পর ইবনে সীনা শাহাজাদার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে খুব ধারালো দু'খানা ছুরি! এ ব্যাপার দেখে সবাই ঘাবড়ে গেলো। অবাক হওয়ার মত কাণ্ড! ইবনে সীনা কি শাহাজাদাকে সত্যি সত্যিই জবাই করবেন!

তিনি দুজন লোককে হুকুম করলেন গরুটাকে ধরে শোয়াবার জন্য। একথা শুনে খুশী হয়ে শাহাজাদা নিজেই শুয়ে পড়লো। জবাই হবার জন্য তৈরী হলো সে। ইবনে সীনা ছুরি হাতে নিয়ে 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলে শাহাজাদার গলায় ছুরি ধরলেন এবং বাঁ হাতটা তার বুকের ওপর রাখলেন। এমন সময় হঠাৎ ঘৃণা ভরে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বললেন ঃ না, গরুটা একদম শুকিয়ে গেছে! এর গোশত দিয়ে মোটেও কাবাব হবে না। একে কিছুদিন ভাল করে খাইয়ে মোটা করো। তখন জবাই করলে গোশত দিয়ে ভাল কাবাব হবে।

ইবনে সীনার কথা শুনে শাহাজাদার মন খারাপ হলো। ভাবলো, সত্যিই তো মোটা না হলে গোশত দিয়ে কি করে কাবাব বানাবে? তারপর ইবনে সীনার কথামত শাহাজাদাকে ভালো-ভালো খাবার দেওয়া হলো। শাহাজাদা মনের খুশিতে পেট ভরে খেতে লাগলো। তাতে সে দিন দিন মোটা তাজা হয়ে উঠলো। আর এদিকে ইবনে সীনা শাহাজাদার প্রতিদিনের খাবারের সাথে দাওয়াই চালাতে লাগলেন। তার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই শাহাজাদার শরীর ভালো হয়ে গেলো। তার মনের রোগও চলে গেলো। সে জবাই হতে আর চাইলো না। বাদশাহ্ ইবনে সীনার ওপর খুবই খুশি হলেন। অবাক হলেন তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি দেখে। এমনি বড়ো চিকিৎসক ছিলেন ইবনে সীনা!

একুশ বছর বয়সে ইবনে সীনা জ্ঞানের নানা বিষয়ে বই লেখা শুরু করলেন। তাঁর লেখা বইগুলো অবাক করে দিয়েছে বিশ্বকে। তিনি ছিলেন জ্ঞানের পরশমণি। যা স্পর্শ করেন তাই সোনা হয়ে যায়! যাতে হাত দিয়েছেন তাতেই চরম সুনাম পেলেন। জ্ঞানের সকল বিষয়ে তাঁর হাত ছিলো। তাই তো দুনিয়ার লোকে বলে, ইবনে সীনা জ্ঞানের যুবরাজ।

এমনিভাবে জ্ঞানের যুবরাজ ইবনে সীনার ছেলেবেলা শেষ হলো। পরবর্তী কর্মজীবন ছিলো তাঁর উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। তাঁর জীবন এতো গুণের সমাহার ছিলো যে, দুনিয়ার মানুষ হাজার বছর পরও তাঁর কথা বলে— মুসলমানরা গর্বের সাথে তাঁর নাম স্মরণ করে। ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয়।

একদিন ইবনে সীনার পেটের ব্যথা দেখা দিলো। ডাক্তার বললেন, অতিরিক্ত সময় পড়াশোনা করার ফলে এ রোগ দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া ও ঠিকমত না ঘুমানোর জন্য তাঁর স্বাস্থ্য ভিষন খারাপ হয়ে পড়লো। পড়াশোনার জন্য ইবনে সীনা স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন নি। এর ফলেই এ কঠিন ব্যথা দেখা দিয়েছে। চিকিৎসা করার পরও তাঁর পেটের ব্যথা কমলো না। দিন দিন বাড়তে লাগলো।

অসুস্থ থেকেও ইবনে সীনা বিশ্রাম গ্রহণ করেন নি। এ অবস্থায়ও তিনি দিনরাত লেখাপড়া করে কাটাতেন। তাঁর বন্ধুরা বলতেন : আপনি শরীরের প্রতি যে রকম অবহেলা করছেন তাতে আপনার হায়াত কমে যেতে পারে। তার জবাবে ইবনে সীনা বললেন : কতদিন বাঁচবো তা কে জানে? হায়াত মওত তো আল্লাহ্‌র হাতে। তবে জীবনের সাধ ও কর্তব্য তাড়াতাড়ি শেষ করাই ভালো।

তাঁর কাছে কর্তব্য কাজ সমাধা করার মত বড়ো কাজ আর কিছুই ছিলো না। অজ্ঞ লোকদেরকে তিনি পছন্দ করতেন না।

ইবনে সীনা একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তিনি যুক্তি দ্বারা ইসলাম ধর্মকে বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ ইসলাম যুক্তি ও প্রগতির ধর্ম। কুসংস্কার ইসলাম ধর্মের লোকেরা বিশ্বাস করে না।

ইবনে সীনার এক চাকর তাঁর কিছু টাকা গোপনে আত্মসাৎ করেছিলো। চোরের মন সব সময়ই ভয়ে ভয়ে থাকে। চাকরটিও সব সময় ভয়ে ছিলো যে, ইবনে সীনার নিকট কখন জানি ব্যাপারটি ধরা পড়ে যায়! তোমরা আগেই জেনেছো যে, ইবনে সীনার পেটের ব্যথা ছিলো। একদিন তাঁর পেটের ব্যথা খুব বেড়ে গেলো। তিনি চাকরকে ঔষধ তৈরী করে দিতে বলেন। চাকর মনে মনে ভাবলো এই তো সুযোগ! তাঁকে যদি মেরে ফেলতে পারি তবে আমার আর ধরা পড়ার ভয় থাকবে না। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ! চাকরটি ঔষধের সাথে আফিম মিশিয়ে দিলো এবং ঔষধ খেতে বললো ইবনে সীনাকে। তিনি বুঝতে পারলেন না। আফিম মেশানো ঔষধ তিনি খেয়ে ফেললেন। ইবনে সীনার শরীর এতে খুবই দুর্বল হয়ে পড়লো। আফিমের বিষ ক্রিয়ার ফলে ইবনে সীনার জীবনী শক্তি শেষ হয়ে এলো। অবশেষে ৪২৮ হিজরীতে মাত্র সাতান্ন বছর বয়সে এ মুসলিম মনীষী ইন্‌তিকাল করলেন।

জ্ঞানের আকাশ থেকে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি ঝরে পড়লো তাঁরই নাম ইবনে সীনা।

বড়ো পীর

আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ইন্‌তিকালের প্রায় চারশ' বছর পরের কথা। মুসলিম জাহানের জন্য তখন বড়োই দুর্দিন। সেই যুগটি ছিলো প্রায় হাজার বছর আগের। খৃস্টানদের অধীন ছিলো রোম সাম্রাজ্য। তার চারপাশে রয়েছে মিশর, ইরান, সিরিয়া এবং আরও কতকগুলো মুসলিম দেশ। খৃস্টানরা মুসলিম দেশগুলো দখল করে নিতে চেয়েছিলো। মাঝে মাঝে রোমক সৈন্যরা মুসলিম দেশগুলোতে এসে হানা দিতো, লুটপাট করতো।

সেই সময় বাগদাদের শাসক ছিলেন মুসলমান। আব্বা-সীয় বংশের বলে তাঁরা পরিচিত ছিলেন। অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন তাঁরা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা অনেক দেশ জয় করে নেন। ফলে বহু দূর পর্যন্ত তাঁদের রাজ্যের সীমা বেড়ে যায়। কিন্তু সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে তাঁরা ছিলেন দুর্বল। সব সময় আরাম-আয়েশ, আমোদ-প্রমোদ, জাঁকজমক ও ভোগ বিলাসের মধ্যে তাঁরা পড়ে থাকতেন। তাঁরা ইসলামের আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন।

ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য এ সময়ে এক শ্রেণীর মুনা-ফিক এক আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদের এ আন্দোলন কারা-মতি আন্দোলন নামে পরিচিত। তাদের কাছে নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাতের কোন মূল্যই ছিলো না। তারা বলে বেড়াতো,

আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন। নামায পড়লেই যে আল্লাহ্ খুশী হবে, তা নয়। তাদের কাছে সুদ, ঘুষ, হালাল-হারামের কোন পার্থক্য ছিলো না। মদ-নেশা, খুন-জখম, লুটতরাজ-সব কিছুই তাদের কাছে জায়েয ছিলো।

মুসলমান সমাজে যখন এমনি দুর্দিন, ঠিক সেই সময় আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বংশে হযরত আবদুল কাদির (রঃ) জন্মগ্রহণ করেন। পারস্যের জিলান শহর ছিলো তাঁর জন্মস্থান। জিলান শহরে জন্ম হওয়ার জন্য তাঁর নামের শেষে জিলানী বলা হয়।

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রঃ)-এর মায়ের নাম ছিলো হযরত সাইয়েদা উম্মুল খায়ের ফাতিমা (রঃ)। মা ছিলেন খুবই পরহেজগার মহিলা। সব সময় পাক পবিত্র থাকতেন। সময় পেলেই কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। হযরত আবদুল কাদির (রঃ) মার পাশে বসে তা শুনতেন। অবাক হওয়ার কথা, মায়ের কুরআন তিলাওয়াত শুনেই তিনি পাঁচ বছর বয়সের সময়েই কুরআনের আঠারো পারা মুখস্থ করে ফেললেন!

পাঁচ বছর যখন বয়স তাঁর, তখন তিনি মক্তবে ভর্তি হন। তিনি পড়াশোনায় খুবই মনোযোগী ছিলেন। ফলে অল্প বয়সেই তিনি অনেক কিছু শিখে ফেলেন। অন্য ছাত্ররা সাত দিনে যতোটুকু পড়া আয়ত্ত করতো, তিনি দু'একদিনের মধ্যে তা শিখে ফেলতেন।

সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করা ছাড়াও হাদীস শরীফ পাঠেও তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। তিনি যখন যে বিষয়ে পড়াশোনা করতেন, তা শেষ না করে অবসর নিতেন না। শিক্ষকদের নানা রকম প্রশ্ন করতেন। শিক্ষকগণ তাঁর জ্ঞান পিপাসা ও প্রতিভা দেখে অবাক হয়ে যেতেন! অল্প বয়সেই

ভালো ছাত্র হিসেবে তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শুধুমাত্র মক্তবের বই পড়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন না, জীবন, জগৎ ও প্রকৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন।

মক্তবের পাঠ শেষ না করতেই তাঁর পিতা ইন্‌তিকাল করেন। তখন সংসারের সমস্ত ভার এসে পড়ে তাঁর উপর। কিন্তু সংসারের চাপ শিক্ষার আগ্রহকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। সময়-মত সংসারের কাজকর্ম শেষ করে আবার লেখাপড়ায় ডুবে যেতেন তিনি।

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) ছোটবেলা থেকেই একটু ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। একা এবং নিরিবিলিতে থাকতেই যেনো তাঁর বেশী ভালো লাগতো। মাঝে মধ্যে তিনি চুপচাপ বসে কি যেনো ভাবতেন! ধর্মের প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিলো। ধর্মের খুঁটিনাটি বিষয় তিনি সযত্নে মেনে চলতেন। তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন। ঝগড়া করা, বাজে তর্ক করা তিনি কখনো পছন্দ করতেন না। সব সময় সত্য কথা বলতেন তিনি। তাঁর ভালো ব্যবহার জ্ঞান ও বুদ্ধি দেখে সবাই ছিলো মুগ্ধ। সবাই তাঁকে সম্মান করতো—ভালোবাসতো।

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) যখন গ্রামের মক্তবের পাঠ শেষ করলেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র সতের বছর। এবার তাঁর উচ্চ শিক্ষার পালা। তিনি নিয়্যত করলেন বাগদাদে গিয়ে নিযামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হবেন। জিলান শহর থেকে বাগদাদ চারশ' মাইলের পথ। তখনকার দিনে পায়ে হেঁটে পথ চলতে হতো। কারণ বর্তমা-নের মত গাড়ী ঘোড়া তখন ছিলো না।

মা তাঁকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বাগদাদ যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। আল্লাহ্ মেহেরবান। দেখতে দেখতে সুযোগ এসে গেলো। তিনি এক কাফেলার সন্ধান পেলেন। কাফেলার সবাই সওদাগর।

জিলান শহর থেকে তাঁরা বাগদাদ যাচ্ছেন। তিনি তাদের সাথে যাত্রা শুরু করলেন। বিদায় দেওয়ার সময় মা তাঁকে কয়েকটি কথা সব সময় মনে রাখতে বললেন ঃ প্রথমত, বিপদে-আপদে সুখে-দুঃখে সব সময় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখবে। দ্বিতীয়ত, কখনো মিথ্যা কথা বলবে না। সত্যবাদিতা মুক্তি দান করে এবং মিথ্যা ধ্বংস করে— এই হাদীসটি সব সময় স্মরণ রাখবে। পরে মা খরচ বাবদ চল্লিশটি মোহর দিয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন।

বাগদাদ যাত্রার তৃতীয় দিন। গভীর রাত। কাফেলায় ডাকাত পড়লো। ডাকাতরা যার কাছে যা পেলো সবই কেড়ে নিলো। কিছুক্ষণ পর একজন ডাকাত এসে তাঁকে বললো ঃ ওহে! তোমার কাছে কোন কিছু আছে কি? তিনি নির্ভয়ে সত্য কথা বললেন ঃ হ্যাঁ, আমার কাছে চল্লিশটি সোনার মোহর আছে। ডাকাতটি অবাক হয়ে বললো ঃ সত্যি কথা বলতে গেলে কোনো? তুমি না বললে তো আমরা তোমার মোহরের কথা জানতেই পেতাম না! তিনি বললেন ঃ মা'র আদেশ, হাজার বিপদে পড়লেও যেনো মিথ্যে কথা না বলি। তা'ছাড়া আল্লাহ্ তো সবই জানেন এবং দেখেন। তাঁর তো অজানা কিছুই নেই। আল্লাহ্‌কে তো আর ফাঁকি দিতে পারি না!

ডাকাতের সরদার অবাক। সত্যের জন্য এতো ত্যাগ স্বীকার! সাথে সাথে পাপ কাজ ছেড়ে দিলো ডাকাত সরদার আর সাথীরা। তাঁর সাথে থেকে এই ডাকাত সরদার একদিন আল্লাহ্‌র ওলী হয়েছিলেন।

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রঃ)-এর বয়স তখন আঠারো বছর। জ্ঞান লাভের জন্য বাগদাদে এসে হাজির হলেন। বাগদাদের নিযামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হলেন তিনি। মনের সমস্ত দরদ আর ভালোবাসা ঢেলে দিলেন তিনি জ্ঞান সাধনায়। কিন্তু

এখানেও বিপদ তাঁর পিছু ছাঁড়লো না। বাগদাদে আসার পরপরই তিনি অর্থ কষ্টে পড়লেন। এমনি অর্থ কষ্টের মধ্যে থেকেও তিনি তিল তিল করে অনেক জ্ঞান অর্জন করলেন। কুরআন, হাদীস, তফসীর, ফিকাহ, দর্শন, ইতিহাস, ব্যাকরণসহ নানা বিষয়ে তিনি জ্ঞান অর্জন করলেন। সুনাম ও কৃতিত্বের সাথে তেরটি বিষয়ে তিনি সনদ লাভ করলেন।

আরো অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভের ইচ্ছা ছিলো তাঁর। কিন্তু বালক আবদুল কাদির (রঃ)–এর হাতে কোন টাকা পয়সা নেই। এই অবস্থায় কি করবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। অর্থের অভাবে যতই দিন যায় তাঁর কষ্টও বেড়ে চলে। এভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কখনো খেয়ে, কখনো না খেয়ে কাটাতে হয়। না খেয়ে তাঁর শরীর ভেংগে পড়তে থাকে। কিন্তু তাঁর সাহস ছিলো অনেক। এতো দুঃখ কষ্টে থেকেও মনোবল হারান নি। এতো অভাব অনাটনে থেকেও কখনো কারো কাছে হাত পাতেননি। অভাবের কথা বলে কারো কাছ থেকে সাহায্য নেবেন এটা তিনি পছন্দ করতেন না। ভিক্ষা করাকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন।

হযরত আবদুল কাদির (রঃ)–এর পোশাক–আশাক ছিলো খুবই সাধারণ। কিন্তু পোশাক সাধারণ হলে কি হবে? তাঁর মন ছিলো খুবই উদার ও অসাধারণ। দয়া–মায়া, স্নেহ–মমতায় তাঁর অন্তর ছিলো ভরা। হাজার দুঃখ কষ্টের মধ্যেও অন্যকে সাহায্য করতেন। নিজের ভবিষ্যতের দিনগুলো কিভাবে কাটবে তা তিনি কখনো ভাবতেন না। তাঁর সব কিছু অন্যের জন্য দান করে আনন্দ পেতেন। এমনিভাবে বালক আবদুল কাদির (রঃ) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসীম রহমতে জীবনে হতে পেরেছিলেন গাউসুল আযম বা বড়ো পীর।

বালক আবদুল কাদির (রঃ)–এর জীবনের একটি ঘটনা।

একবার বাগদাদে ভিষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। খাদ্যদ্রব্যের খুবই অভাব। যারা গরীব, নিরাশ্রয় এবং বিদেশী তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে উঠলো। কে দেবে তাদের খাবার? কে দেবে একটু আশ্রয়? এ সময় বালক আবদুল কাদির (রঃ)-এর অবস্থাটাও ভালো যাচ্ছিলো না। তিনি কয়েক দিন অনাহারে থাকলেন। খাবারের জন্য হন্যে হয়ে ফিরতে লাগলেন তিনি। কিন্তু শহরের কোথাও খাবার পেলেন না। কোথাও খাবার না পেয়ে নিরুপায় হয়ে তিনি দজলা নদীর দিকে ছুটলেন। সেখানে যদি কোন ফলমূল, শাক-সব্জি পাওয়া যায়, এই আশায়। কিন্তু নদীর তীরে এসেও তিনি হতাশ হলেন। সেখানে তাঁর মতো আরো অনেক লোক এসেছে। সবাই ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হযরত আবদুল কাদির (রঃ) উপায় না দেখে শহরে ফিরে এলেন। ক্ষুধার জ্বালায় পা আর চলে না, মুখ দিয়ে কোন কথা সরে না। আল্লাহ্‌র কুদরতি খেলা কে বুঝতে পারে! হঠাৎ সামনে দেখতে পেলেন একটি মসজিদ। সেই মসজিদে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তিনি ঢুকে পড়লেন। মসজিদের এক কোণে ক্লান্ত শরীরে বসে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে এক অচেনা যুবক এসে ঢুকলো মসজিদে। তার হতে কিছু রুটি আর গোশ্‌ত। মসজিদে বসে সে খাবার বের করে খেতে লাগলো।

তার দিকে বালক আবদুল কাদির (রঃ)-এর নজর পড়লো। গোশত রুটি খাওয়ার জন্যে তাঁরও খুব ইচ্ছে হলো। পরক্ষণেই তিনি ভাবলেন, না, পরের খাবার ও পরের জিনিসের প্রতি লোভ করা গোনাহ্‌র কাজ। তিনি একথা ভেবে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন অন্য দিকে এবং মনে মনে খুব লজ্জিতও হলেন।

আগন্তুক যুবকটি হযরত আবদুল কাদির (রঃ)-কে খাবারে

শামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানালো। বললো ঃ আসুন, খাবারে শরীক হোন। যা কিছু আছে, দুজনে ভাগ করে খাই।

তিনি মনে মনে খুব খুশি হলেন যুবকটির উদারতা দেখে। কিন্তু তিনি তাঁর আদর্শ থেকে নড়লেন না। পরের জিনিস তিনি খাবেন না। যুবকটিও নাছোড়বান্দা। বার বার সে হযরত আবদুল কাদির (রঃ)–কে খাবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলো। অবশেষে রাজী না হয়ে তিনি পারলেন না। বার বার কেউ যদি অনুরোধ জানায় আর সে অনুরোধ না রাখা হয় তাহলে বেয়াদবী হয়। তিনি সেই কথা ভেবে যুবকটির সঙ্গে খাবার খেতে বসলেন।

দুজনে খেতে খেতে অনেক কথা হলো। যুবকটি এক সময় হযরত আবদুল কাদির (রঃ)–কে জিজ্ঞেস করলো ঃ আপনি কোথা থেকে এসেছেন ভাই? এখানে কি করেন? হযরত আবদুল কাদির (রঃ) বললেন ঃ আমার বাড়ী জিলানে এখানকার নিযামিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করি। যুবকটি পরম আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করলো ঃ আপনি কি আবদুল কাদিরকে চেনেন? সেও নিযামিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে।

হযরত আবদুল কাদির (রঃ) জবাব দিলেন ঃ আমারই নাম আবদুল কাদির। কিন্তু আপনি কেন তাঁকে খুঁজছেন? তাঁর পরিচয় পেয়ে যুবকটি আদবের সাথে বললো ঃ জনাব, আমার বাড়ীও জিলানে। বাগদাদে আসার সময় আপনার মা আমার কাছে আটটি দীনার দিয়েছিলেন আপনাকে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু বাগদাদে এসে বহু খোঁজ করেও আপনাকে পাইনি। ইতি–মধ্যে আমার নিজের টাকা পয়সাও শেষ হয়ে যায়, দুই দিন ধরে কিছুই খেতে পারি নি। ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে অবশেষে আপনার জন্য আনা দীনার থেকে কিছু খরচ করে এই খাবার কিনেছি। আমানতের খেয়ানত করে আমি মহাগুণাহ্‌র কাজ

করেছি। আপনি আমাকে মাফ করে দিন। এই বলে যুবকটি বাকী দীনারগুলো তাঁকে দিয়ে দিলো।

অর্ধাহারে অনাহারে যিনি দিন কাটাচ্ছেন, যাঁর কাছে খাবার কেনার মতো একটি পয়সা নেই, তাঁর কাছে এই ক'টি দীনারের মূল্য অনেক। দীনারগুলো পেয়ে হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলেন। যুবকটিকে নানান কথা বলে সান্তনা দিলেন। শুধু তাই নয়, যাবার সময় পথ খরচের জন্য যুবকটির হাতে কয়েকটি দীনারও তুলে দিলেন। এমনি উদার এবং স্নেহশীল ছিলেন হযরত আবুল কাদির (রঃ)–এর অন্তর। তাঁর ধৈর্য শক্তি ছিলো অনেক মজবুত। শত অভাব শত বিপদের মধ্যেও তিনি সবর করেছেন। কোনো অবস্থাতেই ভেঙ্গে পড়েন নি।

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) ছিলেন খুবই উদার। সুন্দর ছিলো তাঁর আচার ব্যবহার, নির্মল ছিলো তাঁর চরিত্র। কুরআন ও হাদীসের নিয়মনীতি তিনি নিষ্ঠার সংগ মেনে চলতেন। জীবনকে গড়ে তুলেছিলেন রসূল (সঃ)–এর মহান আদর্শের অনু–করণে। একজন খাঁটি মুসলমানের সকল গুণই ছিলো তাঁর মধ্যে। এজন্য সবাই তাঁকে সম্মান করতো, ভালবাসতো। তাঁর কথা–বার্তা ছিল খুবই মিষ্টি। আপনজনের মতো সকলের সাথে তিনি কথা বলতেন। সবাইকে তিনি ভালবাসতেন। কারোও মনে কষ্ট দিতেন না।

বাড়ীতে মেহমান এলে কখনো তিনি মেহমানকে রেখে একা খাবার খেতেন না। তিনি গরীব দুঃখীদের সাথে অন্তরংগভাবে মিশতেন। মুরুব্বীদের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা ও অল্প কিছুতেই শোকর আদায় করা ইসলামের নিয়ম

একবার তিনি কোন এক কাজে কোথাও যাচ্ছিলেন। কত গুলো শিশু তখন রাস্তার উপর খেলা করছিলো। হঠাৎ একটি

শিশু দৌড়ে এসে তাঁকে বললো ঃ আমাকে কিছু মিঠাই কিনে দাও। তিনি হাসি মুখে শিশুটির আবদার রক্ষা করলেন এবং তখনই তাঁকে এক পয়সার মিষ্টি কিনে দিলেন। তাই দেখে অন্য শিশুরাও তাঁর কাছে মিষ্টির আব্দার করলো। তিনি বিন্দুমাত্র রাগ না করে হাসি মুখে এক এক করে সবাইকে মিষ্টি কিনে দিলেন। আমাদের প্রিয়নবী (সঃ)-এর কথা— যে ব্যক্তি বড়োদের সম্মান করে না এবং ছোটদের স্নেহ করে না, সে রসূল (সঃ)-এর উম্মত নয়। হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) রসূল (সঃ)-এর এই শিক্ষা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন।

তিনি গরীব দুঃখীদেরকে মুক্ত হস্তে দান করতেন। তাঁর কাছে কেউ কিছু চাইলে তাকে কখনো খালি হাতে ফেরাতেন না। তিনি নিজের 'চেয়ে পরের দুঃখ কষ্টের কথা ভাবতেন বেশী। হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) খুব কম কথা বলতেন। বেশী কথা বলা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিলো প্রতিটি কথা ও কাজের জন্যই আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কারো উপর তিনি রাগ করতেন না। কারো মনে কষ্ট হয় এমন কথা বলতেন না। তিনি সব সময় সত্য কথা বলতেন। হাজার মসিবতে পড়লেও মিথ্যে কথা বলতেন না। আবার উচিত কথা বলতে কাউকে ছাড়তেন না, সে রাজা-বাদশাহ্‌, উযির-নাযির যিনিই হোন না কেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে কখনো ভয় পেতেন না।

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) অহংকারী ছিলেন না। তিনি জানতেন অহংকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। বড়ো ভেবে অহংকার করা গুনাহ্‌র কাজ। তাঁর নিজের কাজ অন্য কেউ করে দিক-এটাও তিনি পছন্দ করতেন না। নিজর কাজ তিনি নিজ হাতেই করতেন।

এমনিভাবে সহজ ও সরল জীবন যাপন করতেন আর জ্ঞান সাধনার দ্বারা মুসলমান সমাজের অনেক উপকার করেছেন। তাঁর বাণী ও উপদেশ অনুসরণ করে অনেক মানুষ মুসলমান হয়েছেন। তোমরা যদি বড়ো হয়ে তাঁর উপদেশ ও আদর্শ নিজের জীবনে প্রতিফলিত কর, তাহলে তোমরাও সকলের নিকট সমাদ্রিত হবে।

তাঁর কয়েকটি বাণী এখন থেকে মনে রাখার চেষ্টা করো ঃ

তিনি বলতেন ঃ একজন মানুষ যদি ষাট বছর বাঁচে, হিসেব করলে দেখা যাবে তার জীবনের তিন ভাগের এক ভাগ কুড়ি বছর শুধু সে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। অথচ কুড়ি বছরে অনেক ভালো কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হতো। তাই যতদূর সম্ভব ঘুম কম করে চলা উচিত। জেগে থাকার মধ্যেই সকল মংগল নিহিত রয়েছে এবং ঘুমিয়ে থাকার মধ্যে সকল প্রকার আলসেমী আর দুষ্ট বুদ্ধি লুকিয়ে থাকে।

তিনি বলতেন ঃ

বেশী খাওয়া কখনো ভালো নয়। এতে শরীর খারাপ হয়, মনও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। যারা প্রয়োজনের চেয়ে বেশী খাবার খায় তারা যেনো নিজের দাঁত দিয়ে নিজের কবর তৈরী করে। যে বেশী খায়, গান করে এবং ঘুমায়, সে সমস্ত ভালো কাজ থেকে দূরে সরে যায়। মানুষের মনে রাখা উচিত যে, সে বাঁচার জন্য খায়, খাওয়ার জন্য বাঁচে না।

তিনি বলতেন ঃ

সাধারণত লক্ষ্য করা যায় যে হিংসা করা মানুষের স্বভাব। ধন দৌলতের জন্য, মান সম্মানের জন্য অথবা অন্য কোন কারণে হিংসা পুষণ করে। হে ঈমান–দারগণ ! তোমরা কেন অপরের ধন–দওলত দেখে হিংসা পুষণ করো? তোমরা কি জানো না যে, এ ধরনের হিংসা তোমাদের ঈমানকে দুর্বল করে দেয়। রসূল করীম

(সঃ) বলেছেন ঃ আগুন যেমনভাবে কাঠকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, হিংসাও তেমনি সকল সৎ গুণাবলী ধ্বংস করে দেয়।

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) বলতেন ঃ একজন খাঁটি মুসলমানের অনেক গুলো গুণ থাকতে হবে।

যেমন ঃ

ক. কখনো আল্লাহ্‌র নামে কসম করবে না।

খ. মিথ্যে থেকে সর্বক্ষণ দূরে থাকবে। এমন কি হাসি তামাশা করেও কখনো মিথ্যে কথা বলবে না।

গ. যা ওয়াদা করবে, জীবন গেলেও তা পালন করবে।

ঘ. কাউকে কখনো বদদোয়া করবে না, অভিশাপ দেবে না।

ঙ. কারো ক্ষতির কথা চিন্তা করবে না।

চ. জীবিকার জন্যে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবে।

ছ. কোন ব্যাপারেই এক আল্লাহ্ ছাড়া কারো উপর ভরসা করবে না।

জ. আল্লাহ্‌ই হবেন তোমার একমাত্র ভরসাস্থল।

ঝ. তোমার কথাবার্তা, চলাফেরা ও আচার–ব্যবহার হবে সব সময় বিনীত ও নম্র।

ঞ. আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)–এর আদেশ–নির্দেশ সব সময় মেনে চলবে।

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রঃ)–এর মধ্যে এই সকল গুণাবলী বিদ্যমান ছিলো পরিপূর্ণ ভাবে। তিনি ইসলামের নিয়ম নীতি অনুসরণ করে সহজ সরল জীবন যাপন করতেন বলেই তো তিনি সারা মুসলিম জাহানে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে–

ছিলেন। আল্লাহ্‌র মাহ্‌বুব বান্দা হয়ে তিনি দুনিয়া জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সবাই তাঁকে সম্মান করে ডাকতো বড়ো পীর বলে।

সত্যিই তিনি ছিলেন বড়ো পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রঃ)।

সবাই যার সুনাম করে

খোরাসান।

পারস্যের একটি প্রাচীন জেলা। বর্তমান ইরান দেশকে পারস্য বলা হতো। বলখ খোরাসানের একটি প্রশিদ্ধ শহর। সেই বলখ শহরে এক শিশুর জন্ম হয়। সাধারণ শিশু তিনি নন। অনেক গুণের অধিকারী হন এই শিশু। সুন্দর দুটো চোখ। চমৎকার দেহের গড়ন। শান্ত ও ধীর স্থির। যে শিশুর জন্মে বলখ শহর ধন্য। এই অসা-মান্য শিশু পরে সারা মুসলিম জাহানে মওলানা নামে পরিতি হন। তিনি জ্ঞান সাধনার দ্বারা মুসলিম জাতির জন্য অনেক জ্ঞান গর্ভ পুস্তক লিখে গেছেন।

তাঁর নাম মাওলানা রুমী। পুরো নাম মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন রুমী। পিতার নাম মোহাম্মদ বাহাউদ্দীন। পিতা প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর বংশধর। তাঁর মাতা ছিলেন আমাদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ)-র বংশধর। পিতা ও মাতার দিক দিয়ে তিনি মস্ত বড়ো বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মেধা ও চারিত্রিক গুণাবলী দিয়ে তিনি বংশের সুনাম বজায় রেখেছিলেন।

পিতা মাওলানা বাহাউদ্দীন তখনকার নামকরা আলিম ছিলেন। তিনি সকলের কাছে প্রিয় ছিলেন জ্ঞানী ও বুযুর্গ হিসেবে। সত্য কথা বলতে তিনি কখনো পিছপা হতেন না। এজন্য সেই সময়ে খোরাসানের সুলতানের সংগে তাঁর নানা রকম মতভেদ

দেখা দেয়। আসলে জ্ঞানী লোকেরা কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন না। শত বিপদ এলেও যা সত্য ও ঠিক তা বলে যান।

সুলতান খাওয়ারিজম শাহ্ তখন খোরাসানের শাসনকর্তা। সুলতান খুব ভালো লোক ছিলেন না। নানা রকম অন্যায় কাজ করতো। তাঁর অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিছু লোক কথা বলতে লাগলেন। সুলতান মনে করতো তাঁর বিরুদ্ধে যাঁরা কথা বলতেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা বাহাউদ্দীন একজন।

সুলতান খাওয়ারিজম শাহ্ রেগে গেলেন মাওলানা বাহা-উদ্দীনের উপর। তিনি অত্যাচার করতে থাকেন। কিন্তু বাহাউদ্দীন ছিলেন আপোষহীন। তিনি নিজের সম্মান বজায় রাখার জন্য বলখ শহর ত্যাগ করলেন।

তিনি শিশু রুমীকে সাথে করে পায়ে হেঁটে বিদেশের পথে রওয়ানা হলেন। বাগদাদ, মক্কা শরীফ, মালটা, লারিন্দা প্রভৃতি শহর হয়ে অবশেষে কোনিয়া শহরে হাজির হন।

কোনিয়া রোমের একটি প্রাচীন শহর। ফোরাত নদীর তীরে শহরটি অবস্থিত। আলাউদ্দীন কায়কোবাদ তখন কোনিয়ার শাসন-কর্তা। তিনি তাঁদেরকে সেখানে থাকার অনুমতি দিলেন। তাঁরা স্থায়ীভাবে রোমে বসবাস করতে থাকেন। সেই স্থানের নাম অনুসারে মাওলানা জালাল উদ্দীন 'রুমী' নামে প্রশিদ্ধ লাভ করেন।

বালক রুমীর শিক্ষা জীবন শুরু হয় পিতার হাতে। সায়্যীদ বোরহানউদ্দীন ছিলেন সেকালের মস্ত বড় জ্ঞানী ব্যক্তি। তাঁর কাছেই রুমীর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় এবং প্রথম চার পাঁচ বছর তাঁর কাছেই শিক্ষা লাভ করেন তিনি। মাত্র কয়েক বছর বয়স তাঁর। এই বয়সেই তিনি কুরআন মুখস্থ করে ফেললেন। খুবই সুন্দর ও ভক্তি সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কুরআন তিলাওয়াতের সময় দু'চোখ দিয়ে তাঁর অশ্রু গড়িয়ে পড়তো

অনবরত। অবাক হওয়ার মতোই ব্যাপার। কেবল বই পুস্তকের মধ্যেই রুমীর জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিলো না। রুমী বাল্য বয়সেই মুখস্থ করেছিলেন অনেক হাদীস।

রুমীর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তাঁর বাবা মা পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা যাত্রা করেন। রুমীও মাতাপিতার সংগে হজ্জ করেন। সেই সময় তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশ দেখার সুযোগ পান। এতে তাঁর জ্ঞান অনেক বেড়ে যায়।

শায়েখ ফরিদউদ্দীন আত্তার ফারসী সাহিত্যের একজন বড় কবি। শুধু নাম করা কবি নন, তিনি একজন দার্শনিক ও বিখ্যাত সূফী দরবেশ ছিলেন। রুমীর বয়স যখন বার বছর তখন তাঁর বাবা নিশাপুরে শায়েখ ফরিদউদ্দীন আত্তারের কাছে তাঁকে নিয়ে যান।

বালক রুমীকে দেখেই শায়েখ ফরিদউদ্দীন আত্তার খুব খুশী হলেন। রুমীর প্রতিভা দেখে তিনি অবাক হয়ে বললেন ঃ এই বালক সারা দুনিয়ায় এমন জ্ঞানের আগুন জ্বালাবে যে আগুনে পুড়ে বহু মানুষ খাঁটি সোনায় পরিণত হবে। যতদিন দুনিয়া টিকে থাকবে ততদিন তাঁর নাম মুছে যাবে না। সবাই সুনাম করবে।

সূফী দরবেশ কাকে বলে? যাঁরা আল্লাহ্‌র জ্ঞান সাধনায় সাধক হয়েছেন তাঁদেরকে বলা হয় সূফী দরবেশ। শামস-ই-তাব্রিজ ছিলেন এক বড়ো সূফী ও দরবেশ। মাওলানা রুমী তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। বালক রুমীর জীবনে চার জন পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তির অবদান সব চেয়ে বেশী। তাঁদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন তাঁর বাবা মোহাম্মদ বাহাউদ্দীন, দ্বিতীয় ফরিদ উদ্দীন আত্তার, তৃতীয় সায়্যীদ বোরহান উদ্দীন এবং চতুর্থ শামস-ই-তাব্রিজ।

ধর্ম নিয়ে আলোচনায় মশগুল থাকতেন তিনি। মাত্র ছয় বছর বয়স থেকে তিনি রীতিমত রোযা রাখা শুরু করেন। ছোট-

বেলায় খেলাধুলায় সময় কাটাতেন না। যেখানে সেখানে আড্ডা দিতেন না। সব সময় শুধু ভাবতেন আর ভাবতেন। তিনি ভাবতেন কে তিনি? কী এই পৃথিবী? কোত্থেকে এতো কিছুর আগমন? কোথায় আবার তারা ফিরে যাচ্ছে? এমনি ভাবনায় সময় কাটতো তাঁর।

মহাকবি রুমী মুসলমানদের কাছে খুবই পরিচতি। শুধু কি তাই? তাঁর লেখা মহাকাব্য মাস্‌নুবী মুসলমানদের অত্যন্ত প্রিয় মহা গ্রন্থ।

মাসনুবী ফার্সী ভাষায় রচিত। সবাই নাম দিয়েছে 'মাসনুবী শরীফ'। পৃথিবীর সবকটি সেরা ভাষায় মাসনুবীর অনুবাদ হয়েছে। প্রায় তেতাল্লিশ বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করে তিনি মাসনুবী শরীফ লিখেছেন। মাসনুবীর ভাষা সহজ—বর্ণনা ভংগী খুবই মধুর। বাংলা ভাষায় মাসনুবীর অনুবাদ হয়েছে। ইউরোপের এক নামকরা মনীষী উইলসন তাঁর নাম। তিনি মাসনুবী শরীফ ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন দুনিয়ার সব ধরনের মানুষেরই মাসনুবী পাঠ করা উচিত। কারণ এতে শুধু ধর্মের কথাই বলা হয়নি, এটা হচ্ছে সকল মানুষর জীবনের তত্ত্বকথা।

রুমীর মাসনুবী শরীফের একটি সুন্দর কাহিনী বলছি শোনো। অনেক অনেক দিন আগের কথা। মহা পরাক্রমশালী এক সম্রাট ছিলেন। একদিন সম্রাট মন্ত্রীদেরকে সাথে করে শিকার করতে বের হলেন। বন আর বন। সেই বনের গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে তিনি হাঁটছেন। হঠাৎ সম্রাটের চোখে পড়লো এক সুন্দরী ক্রীতদাসী। সম্রাট সুন্দরী ক্রীতদাসীর রূপে মুগ্ধ হলেন। মুগ্ধ বাদশাহ অনেক অনেক টাকা দিয়ে ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে নিলেন। সুন্দরী ক্রীতদাসী বাদশার সাথী হলো। বাদশাও ক্রীতদাসীকে পেয়ে খুব খুশী। কিন্তু আল্লাহ্‌র কুদরতী খেলা কে বুঝতে পারে! হঠাৎ করে ক্রীতদাসী

রোগে অসুস্থ হয়ে পড়লো।

বাদশার অবস্থাটা কেমন ছিলো একটু ভেবে দেখো। প্রবাদ আছে এক ব্যক্তির একটি গাধা ছিলো, কিন্তু ছিলো না গাধা পালার মত কোন লোক। আবার যখন গাধা পালার লোক যোগাড় হলো, অমনি বাঘে ধরে নিয়ে গেলো গাধাটি। ছিলো একটি কলসী, কিন্তু পানি ছিলো না তাতে। পানি যখন পাওয়া গেলো, তখনই কলসীটি ভেঙ্গে গেলো। বাদশার কপালও ছিলো ঠিক তেমন।

বাদশাহ্ দেশ বিদেশের নামকরা ডাক্তার ডাকলেন। ডাক্তার-দেরকে বললেন ঃ আমার এবং ক্রীতদাসীর-এ দুইজনের জীবন নির্ভর করছে আপনার সুচিকিৎসার উপর। যিনি আমার প্রিয় ক্রীতদাসীকে ভালো করতে পারবেন তাঁকে দেবো অনেক অনেক মণিমুক্তা।

সেখানে ডাক্তার ছিলেন অনেক। বাদশার কথায় সবাই বল-লেন ঃ চিন্তা করবেন না জাঁহাপনা। আমরা আমাদের সকল ডাক্তারী জ্ঞান দিয়ে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করবো। আমরা এক একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক এক বিভাগে পারদর্শী। সকল রোগের ওষুধ আছে আমাদের হাতে।

কিন্তু ডাক্তাররা শত চেষ্টা করেও রোগীকে আর ভালো করতে পারলেন না। সুন্দরী ক্রীতদাসী প্রায় মর মর অবস্থা। বাদশার চোখে পানি। তিনি দেখলেন এক একটি ওষুধ দেওয়ার পর সৃষ্টি হয় এক একটি রোগ। সবাই ভেবে অবাক। কিন্তু কেন এমন হলো বলতে পারো? ডাক্তাররা ক্রীতদাসীর চিকিৎসা করতে গিয়ে ভুলে গিয়েছিলেন আল্লাহ্‌র নাম। তাঁরা ছিলেন অহংকারী। তাঁরা তাঁদের নিজেদের গর্বে এতই মত্ত ছিলেন যে একবারও বললেন না ইনশাআল্লাহ্। আর তোমরা জান আল্লাহ্ অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

ডাক্তারদের ওষুধে কোন কাজ হচ্ছিলো না বাদশাহ্ তা

বুঝতে পারলেন। কারণ বাদশাহ্ ছিলেন খুবই আল্লাহ্ভক্ত। আল্লাহ্র রহস্য সম্পর্কে ছিলো তাঁর জ্ঞান।

তাই বাদশাহ্ খালি পায়ে ছুটে গেলেন মসজিদে। মসজিদ আল্লাহ্র ঘর। সেখানে সবাই সমান। বাদশাহ্ অনুতপ্ত হলেন এবং হু হু করে কেঁদে উঠলেন। তাঁর চোখের পানিতে জায়নামায ভিজে গেল। কিছুক্ষণ কাঁদার পর বাদশাহ্ মুনাজাত করলেন আল্লাহ্র দরবারে। বাদশাহ্ দু'হাত তুলে আল্লাহ্র দরবারে কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যে বাদশাহ্ স্বপ্নে দেখলেন, একজন পরহেজগার লোক বাদশাহ্কে বলছেন ঃ হে বাদশাহ্, আল্লাহ্র দরবারে তোমার মুনাজাত কবুল হয়েছে।

সকাল বেলায় বাদশাহ্ দেখলেন এক পরহেজগার হেকিম তার দেহলীযে উপস্থিত। প্রেমিক বাদশাহ্ হেকিমকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন।

হেকিম সুন্দরী ক্রীতদাসীর সাথে আলোচনা করলেন তার রোগ সম্পর্কে। হেকিম বাদশাকে বললেন ঃ ক্রীতদাসীর মানসিক রোগ হয়েছে। অন্য কোন ওষুধে তাঁর রোগ ভালো হবে না। ক্রীত–দাসীর ইচ্ছামত তার মনের চিকিৎসা করার পর সুন্দরী ক্রীতদাসী ভালো হয়ে উঠলো। প্রেমের কারণেই সুন্দরী ক্রীতদাসী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। আধ্যাত্মিক প্রেমকে বুঝানোর জন্য রুমী এরূপ প্রেমের উল্লেখ করেছেন তাঁর লেখা মাসনুবী শরীফে। মাসনুবী শরীফের জন্যই লোকেরা তাঁকে উপাধি দিলো বিশ্বপ্রেমিক। সবাই বলে তাঁকে বিশ্ব প্রেমিক রুমী।

বিশ্ব প্রেমিক রুমী কবি হিসেবে পরিচিত হলেও আসলে তিনি ছিলেন মহাসাধক ও সুফী। এ কারণে মুসলমানরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম করে।

তোমরাও বড় হয়ে এই মহা সাধকের জীবনী পড়বে।

মহান দার্শনিক

মুসলিম জাহানের একটি দেশ। নাম ইরান। আগে দেশটির নাম ছিলো পারস্য। সেই ইরান দেশের একটি দেশ খোরাসান। খোরাসান প্রদেশের তুস জেলা। জেলার দু'টি শহর তাহেরান এবং তাকান। তাহেরান শহরের একটি ছেলে। নাম তাঁর আল-গায্যালী (রঃ)। পুরা নাম আবু হামিদ মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে তাওস আহম্মদ আল তূসী আল সাফী আল নিশাপুরী।

ছোটবেলা থেকেই আল-গায্যালী (রঃ) একটু ভিন্ন রকম ছিলেন। একা এবং নিরিবিলিতে থাকতে তাঁর বেশী ভালো লাগতো।

তাঁর আব্বা ছিলেন খুবই পরহেজগার লোক। সব সময় পাক পবিত্র থাকতেন। সময় পেলেই কুরআন তিলাওয়াত কর-তেন। আল গায্যালী (রঃ) তখনও শিশু। তাঁর পিতা ইন্তিকাল করলেন। পিতার মৃত্যুর কয়েক বছর আগে মা দুটি সন্তান রেখে মারা যান। পিতা নাবালক ছেলে দু'টিকে এক পরহেজগার বন্ধুর কাছে রেখে যান। বন্ধুর হাতে কিছু টাকা দিয়ে তাঁকে অনুরোধ করলেন এই টাকা দ্বারা তাঁদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে।

বেশী টাকা পয়সা তিনি রেখে যেতে পারলেন না। কারণ তাঁদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিলো না।

পিতার বন্ধুর নিকট আল-গায্‌যালী (রঃ)-র প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হলো। পড়াশোনায় তিনি ছিলেন খুবই মনোযোগী। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর অনেক কিছু শেখা হয়ে গেলো। সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ মুখস্থ করা ছাড়াও হাদীস শরীফ পাঠেও তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। অল্প বয়সেই ভালো ছাত্র হিসেবে তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

শুধুমাত্র ওস্তাদের নিকট বই পড়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকেত পারতেন না। জীবন, জগত ও প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি চিন্তা করতেন গভীরভাবে। তিনি যে বিষয়ে পড়াশোনা করতেন তা শেষ না করে থামতেন না। পিতার বন্ধু তাঁর জ্ঞান পিপাসা দেখে অবাক হয়ে যেতেন। তিনি দু'হাত তুলে তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করতেন।

এবার তাঁর উচ্চ শিক্ষার পালা। সেই সময়ে স্কুল কলেজ খুব বেশী ছিলো না। নামকরা ওস্তাদগণ নিজেদের বাড়ীতে অথবা মসজিদে ছাত্রদের শিক্ষা দান করতেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মসজিদেই সব কিছু হতো, শিক্ষা বলো, বিচার বলো, দেশ শাসন বলো, সকল কিছুই মসজিদে হতো। ধনী লোকেরা সে রকম শিক্ষায় অর্থ সাহায্য করতেন, ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার খরচও তাঁরা বহন করতেন।

সবেমাত্র তাঁর আঠার বছর বয়স। আল-গায্‌যালী (রঃ) উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য পায়ে হেঁটে জুর্জান প্রদেশে হাজির হলেন।

সেই সময়ে শিক্ষাদানের একটা নিয়ম ছিলো। শিক্ষক ক্লাসে যা পড়াতেন ছাত্ররা তা লিখে রাখতো। এ রকম লিখে রাখা খাতাকে নোট বই বলা হয়।

একদিন জুর্জান প্রদেশ থেকে পায়ে হেঁটে বাড়ী ফেরার পথে ডাকাত দল বালক গায্‌যালীকে (রঃ) আক্রমণ করলো। ডাকাতরা

তাঁর দেহ তল্লাশী করে তাঁর নিকট থেকে সব কিছু কেড়ে নিলো। ডাকাতরা তাঁর নোটবইগুলোও কেড়ে নিলো। আল-গায্যালী (রঃ) এতে খুবই দুঃখিত হলেন ; কিন্তু ভয় পেলেন না। কিছুক্ষণ পর সাহস করে তিনি ডাকাত সরদারের কাছে নোট বইগুলো ফেরত চাইলেন। ডাকাত সরদার তাচ্ছিল্যের স্বরে বললো ঃ ওহ্ তোমার বিদ্যা তো আমার হাতে। তুমি তো এখন বিদ্যাহীন। বিদ্যা পুস্তকে রেখেও বিদ্বান হওয়া যায় নাকি? যাও, তোমার নোটবই-গুলো নিয়ে যাও।

গায্যালী (রঃ) ডাকাত সরদারের কথায় লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। বাড়ী ফিরে রাত দিন পড়ার কাজে পরিশ্রম করতে লাগলেন। অবশেষে তিন বছরের মধ্যে তিনি সমস্ত নোট মুখস্থ করে ফেললেন।

১০৭৭ সাল। আল-গায্যালী (রঃ)-এর বয়স তখন বিশ বছর। আরও উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি নিশাপুরে হাযির হলেন। তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান ছিলো নিশাপুর। বাগদাদের নিযামিয়া মাদ্রাসার মতো নিশাপুরের বায়হাকিয়া মাদ্রাসারও তখন খুব নাম ডাক। এটি ছিলো ইসলাম জগতের সর্বপ্রথম মাদ্রাসা। দেশ বিদেশের বহু ছাত্র এখানে এসে পড়াশোনা করতো।

ইমামুল হারামায়েন মুসলিম বিশ্বের প্রশিদ্ধ বুযুর্গ ও আলেম। আল-গায্যালী (রঃ) মনের সমস্ত দরদ আর ভালোবাসা দিয়ে এ বুযুর্গ আলেমের নিকট জ্ঞান সাধনা করতে থাকলেন। জ্ঞান অর্জনে তাঁর আগ্রহ আর অসাধারণ প্রতিভা অল্প দিনের মধ্যেই ইমামুল হারামায়েনের নজরে পড়লো। আর কেনই বা পড়বে না? তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান সাধক। আল-গায্যালী (রঃ)-এর মতো প্রতিভাকে চিনতে তাঁর ভুল হবে কেন? তাঁর দিকে তিনি আরো মনোযোগ দিলেন। ফলে অল্প দিনের মধ্যে তিনি মুসলিম জাহানের এক

বড় প্রতিভা হিসেবে সুনাম অর্জন করলেন। তখন আল-গায্যালী (রঃ)-এর মতো এত বড়ো আলেম আর একজনও ছিলেন না।

আল-গায্যালী (রঃ) পরবর্তীকালে মস্ত বড়ো আলেম, মুহাদ্দিস, মুফাছ্ছির ও ইসলামী দর্শনবিশারদ হয়েছেন।

পরনিন্দা করা ভালো নয়। কাজে বা কথায় একজন অন্যজনের নিন্দা করাকে বলে পরনিন্দা। ইসলামে পরনিন্দাকে গীবত বলে। গীবত করা গুনাহ্র কাজ। ইমাম গায্যালী (রঃ) গীবতের কারণ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। কেন মানুষ একে অপরের গীবত করে? তার উত্তরে তিনি আটটি কারণের কথা বলেছেন ঃ

১. মানুষ যখন কারো কোন কথায় রাগ হয়, রাগের মাথায় সে অন্যের সমালোচনা করে। এতে সে মনে করে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। এতে তার রাগ কমে।

২ এক সাথে বসে কয়েকজন লোক যদি কারো গীবত করে আর সেই সময় যদি কোন লোক সেখানে এসে উপস্থিত হয় তখন সেও গীবত করে থাকে। কারণ তার চুপচাপ বসে থাকা কেউ পছন্দ করবে না।

৩. কোন লোক যদি মনে করে যে, ভবিষ্যতে লোকটি আমার দুর্নাম করতে পারে তবে সে ঐ ব্যক্তির নামে কুৎসা রটনা করে। এতে সে বোঝাতে চায় যে, লোকটি সম্পর্কে সত্য কথা বলায় সে আমার সাথে এমন শত্রুতা করছে।

৪. কারো প্রতি যখন মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হয় তখন সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য অন্য লোককে অপবাদ দেয়।

৫. নিজের কৃতিত্ব প্রমাণ করার জন্য সাধারণত অন্য লোকের দোষ গেয়ে বেড়ায়।

৬. পরশ্রী লোক তার সমসাময়িক কোন লোকের সুনাম সহ্য

করতে পারে না। অবশেষে কোন উপায় না দেখে গীবত করে যাতে লোকের কাছে তার সুনাম নষ্ট হয়।

৭. হাসি তামসার জন্য অনেক সময় খেয়াল খুশি মতো একে অন্যের গীবত করে থাকে।

৮. কারো প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রুপ এবং উপহাস করার উদ্দেশ্যে অনেক সময় গীবত করা হয়।

ইমাম গায্যালী (রঃ) গীবতকারীকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন।

শিক্ষা গ্রহণের সময়ই দেশের চারদিকে ইমাম গায্যালী (রঃ)-র সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

জ্ঞানসাধনার সাথে সাথে তিনি এক আল্লাহ্র খোঁজ করতে লাগলেন। রাতদিন পরিশ্রমের ফলে তাঁর শরীরও দুর্বল হয়ে পড়লো। তাঁর খাওয়া-দাওয়া কমে গেলো। রাত্রে ঘুম হতো না। শরীর দুর্বল ও রক্তহীন হয়ে পড়লো। লোকের অনুরোধে তিনি ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। ডাক্তার তাঁকে নিয়মমত ওষুধ দিলেন। কিন্তু কোন কাজ হলো না। তাঁর এ রোগ আল্লাহ্কে পাবার জন্য। তাঁকে না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর এ রোগ ভালো হবে না। তাই দুনিয়ার সব কিছু ভুলে তিনি একমাত্র আল্লাহ্র চিন্তায় মশগুল থাকতেন। ছোটবেলা থেকে তিনি ছিলেন চঞ্চল। পরাধীনতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। স্বাধীনভাবে থাকতে তিনি ভালবাসতেন। ঘর সংসারের মায়া ত্যাগ করলেন। আত্মীয় পরিজন সবাইকে ভুলে গেলেন। ধন-সম্পদ ও মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ করলেন। মাত্র একখানা মোটা কম্বল গায়ে দিয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে তিনি আল্লাহ্র খোঁজে বের হয়ে পড়লেন। একমাত্র ভাবনা কোথায় গেলে তিনি আল্লাহ্র খোঁজ পাবেন। আল্লাহ্র চিন্তায় তিনি ডুবে গেলেন।

আল্লাহ্র প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিলো অনেক বেশী। সব সমস্যার

সমাধান করতেন তিনি কুরআন ও হাদীসের আলোকে।

মানুষের শরীর। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবিধি। বুকের মধ্যে যে হৃদপিণ্ডটি ধুক ধুক করে তা আত্মা নয়। আত্মা ভিন্ন বস্তু। হৃদ-পিণ্ডের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। হৃদপিণ্ড একটি গোশ্‌তপিণ্ডমাত্র। মানুষ মরে গেলেও হৃদপিণ্ড থাকে। মরলে কিন্তু আত্মা থাকে না। মানুষের শরীর ধ্বংস্‌ হয়, কিন্তু আত্মা কখনও ধ্বংস হয় না। মৃত্যুর পরও আত্মা জীবিত থাকে। ইমাম গায্‌যালী (রঃ) এ সত্যকে নিয়ে গবেষণা করেন। এবং তাঁর গবেষণার ফলেআল্লাহ্‌ তাঁকে জ্ঞান দান করেন। তাঁর গভীর জ্ঞান দেখে ছোট বড়ো সবাই মুগ্ধ হয়ে যেতো। তখন দুনিয়া জুড়ে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় মুসলিম জাহানে তাঁর মত জ্ঞানী লোক আর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। তাই তাঁকে ইমাম উপাধি দেওয়া হয়। ইমাম অর্থ নেতা। তিনি কোন রাজ্যের নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন জ্ঞান ও চিন্তারাজ্যের নেতা।

ইসলামী দর্শনে ছিলো অগাধ জ্ঞান। মুসলমানদের কাছে তিনি দার্শনিক হিসেবেই পরিচিত। এই দার্শনিক হিজরী ৫০৫ সালে মাত্র ৫৫ বছর বয়সে ইন্‌তিকাল করেন। সম্পুর্ণ সুস্থ শরীরেই তিনি ইন্‌তিকাল করেন। মৃত্যুর দিন ভোরে উঠে অযু করে তিনি ফজরের নামায পড়েন। অতঃপর কাফনের কাপড় আনতে আদেশ করেন। কাপড় আনা হলে তাতে চুমু দিলেন ও কেবলামূখী হয়ে শুয়ে পড়েন এবং জীবনের স্রষ্টাকে জীবন দান করেন। এই মহামনিষী ও দার্শনিক আবু হামেদ মোহাম্মদ আল গাযযালী সমস্ত দুনিয়ায় আজ ও ইমাম গাযযালী নামে প্রসিদ্ধ।

চিকিৎসকের ছেলে বিজ্ঞানী

এক হাজার বছর আগেকার কথা। হাইয়ান তখন কুফা নগরীর চিকিৎসক। কুফা ইরাক দেশে অবস্থিত। উমাইয়া শাসনের রাজধানী তখন কুফা। উমাইয়া বংশের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ভাব। তাই মাতৃভূমি দক্ষিণ আরব ছেড়ে কুফায় এলেন তিনি। মনে দুনিয়ার অশান্তি। মাথায় তাঁর রাজ্যের চিন্তা কিভাবে উমাইয়া রাজতন্ত্রের অবসান ঘটানো যায়। এই ইচ্ছা পূরণের জন্য সংগ্রাম চালাতে হাইয়ান সপরিবারে তুস নগরের দিকে যাত্রা করলেন। সেই সময় তাঁর একটি ছেলে সন্তান ভূমিষ্ট হয়।

ছেলেটির নাম রাখা হয় জাবীর ইবনে হাইয়ান। মা বুকের মাঝে আগলে রাখলেন। মায়ের আদর আর বাপের স্নেহ–দুই–ই পেলেন জাবীর। কিন্তু বাপের স্নেহ তাঁর ভাগ্যে বেশি দিন মিললো না। হাইয়ানের ষড়যন্ত্রের কথা খলিফা জানতে পারলেন। খলিফা হাইয়ানকে ধরে আনলেন এবং মৃত্যুদণ্ড দিলেন।

অসহায় শিশু জাবীরকে নিয়ে মা যাত্রা করলেন দক্ষিণ আরবে। সাধারণ শিশু নন, অনেক গুণের অধিকারী এই শিশু। এই অসামান্য শিশু পরে সারা মুসলিম জাহানে পরিচিত হন একজন রসায়নবিদ হিসেবে। জাবির ইবনে হাইয়ান তাঁর শিক্ষা–জীবন শুরু করেন দক্ষিণ আরবের স্থানীয় বিদ্যালয়ে। ইয়েমেনের নাম করা গণিত শিক্ষক হারবী আল হিমারী তাঁকে গণিত শিক্ষা

দেন। চিকিৎসকের ছেলে জাবীর। তাই চিকিৎসার উপরও জ্ঞানলাভ করলেন তিনি অনেক।

তখনকার দিনে বর্তমান যুগর মতো বড়ো বড়ো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো না। সুযোগ–সুবিধাও ছিলো কম। যাঁরা জ্ঞান পিপাসু তাঁরা অনেক কষ্ট করতেন। কষ্ট ও মেহনত করে তাঁদের জ্ঞান আহরণ করতে হতো। বহুদুর দেশ পাড়ি দিতে হতো তাঁদেরকে।

জাবীর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ফেললেন। এতে তাঁর সাধ মিটলো না। তাই তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য দক্ষিণ আরব ছেড়ে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। সেই ধু ধু বলুময় পথে। কখনো মরুভূমি, কখনো পাহাড়–পর্বত, বনজংগল পেরিয়ে পথ হাঁটছেন তো হাঁটছেনই। বুকে তাঁর অনেক আশা। তাই পথের কোন বিপদই তাঁকে ঠেকাতে পারলো না। অবশেষে অনেক পথ হেঁটে পিতার কর্মস্থল কুফা নগরীতে এসে হাজির হলেন।

ইমাম জাফর আস সাদিক তখন কুফার বড়ো জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি জাবীরকে সাধ্যমত বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। কিন্তু এতেও তাঁর মন শান্ত হলো না—তৃপ্তি পেলেন না। তিনি যন্ত্রপাতি নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। হাতে কলমে রসায়নের বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করলেন তিনি। অতঃপর তিনি 'নাইট্রিক এসিড' আবিস্কার করলেন। ইমাম জাফর আস সাদিকের কাছেই জাবির রসায়নশাস্ত্র শেখেন। রসায়ন চর্চা করে তিনি অনেক খ্যাতি অর্জন করেন।

ইমাম জাফরের সাথে পরিচয়ে জাবিরের অনেক লাভ হয়। তাঁরই চেষ্টায় তিনি শাহী দরবারের নেক নযরে পড়েন। তখন ঘটে একটি চমৎকার ঘটনা। খলীফা হারুন আর–রশীদের উযিরে আযম ইয়াহিয়ার এক সুন্দরী বাঁদী ছিলো। একবার বাঁদীর কঠিন অসুখ হয়। দেশ বিদেশ থেকে অনেক হেকিম ডাকা হলো তাঁর চিকিৎসার

জন্য। সবাই একে একে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে অসুখ কিছুতেই সারে না। কেউ সারাতেও পারলেন না। শেষে ডাক পড়ে জাবিরের। আর তাঁর সুচিকিৎসায় বাঁদীর অসুখ একদম সেরে যায়। ফলে জাবির উযিরের আপন জন হয়ে পড়েন। আর সেই সুযোগে তিনি খলীফা হারুন আর-রশীদেরও সুনজরে পড়েন। জাবির খুব খুশি। এবার কুফা ছেড়ে তিনি বাগদাদে চলে আসেন। সেখানে একদিকে চলে তাঁর ডাক্তারী আর এক দিকে চলে বিজ্ঞানের নানান বিষয় নিয়ে গবেষণা।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই রাজনীতির নানা রকম খেলা শুরু হলো সেখানে। জাবিরের রাজনীতি ভালো লাগে না। তবুও দুষ্ট লোকেরা চক্রান্ত করে তাঁকে জড়িয়ে ফেলে। খলীফা তাঁকে দুশমন ভাবলেন। তিনি রাজদ্রোহী বলে সাব্যস্ত হন।

জাবির মহাভাবনায় পড়ে গেলেন। তিনি জানেন রাজ-দ্রোহীর একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। জান বাঁচানোর উপায় খুঁজতে থাকেন তিনি। অনেক ভাবনার পর উপায় না দেখে তিনি কুফায় পালিয়ে গেলেন।

কুফায় তিনি বসবাস শুরু করেন। এবং বিজ্ঞান সাধনায় মনোযোগ দেন।

তাঁর জীবন ছিলো এতোদিন কষ্টের আর সংগ্রামের। কুফায় ফিরে এসে তিনি পেলেন শান্তি। এখানে তিনি গড়ে তুললেন একটি ল্যাবরেটরি—গবেষণাগার। তিনি নিজেই গবেষণা করবেন এতে। ল্যাবরেটরী ছাড়া বিজ্ঞানের গবেষণা ভালো চলে না।

কুফায় তিনি যে ল্যাবরেটরি তৈরী করেন সেটাই ছিলো দুনিয়ার প্রথম বিজ্ঞান গবেষণাগার। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জাবির এই ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানের সাধনা করেছেন।

পরবর্তী জীবনে জাবির একদিকে ডাক্তার আর এক দিকে

রসায়নবিদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র এই দুটি বিষয় নিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দেন নি। আরো নানা রকম বিষয়ে তিনি গবেষণা করেছিলেন। সে কারণেই তাঁর খ্যাতি ছিলো দুনিয়াজোড়া।

জাবির ডাক্তারী আর রসায়নসহ নানা বিষয়ের উপর বহু বই লিখেছেন। তাঁর এসব বইয়ের বিষয় ছিলো চিকিৎসা, রসায়ন, খনিজ পদার্থ, বিশেষ করে নানা করম পাথর এবং দর্শনও, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি।

শুধুমাত্র ডাক্তারীর উপর তিনি বই লেখেন পাঁচ শ'র মতো। তাঁর লেখা ডাক্তারী বইগুলোতে ছিলো ঔষধ বানানোর কায়দা–কানুন, রোগ ধরবার উপায়, ঔষধ নির্বাচন এবং এ্যানাটমি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব জ্ঞানের অনেক কথা। এতে আরো ছিলো চিকিৎসা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণ। এমনকি বিষের উপ–রেও তাঁর লেখা একখানি বই ছিলো। বইটির নাম আল–জহর।

ধারণা করা হয় তাঁর নিজের চিন্তাভাবনা আর গবেষণার ফলে চিকিৎসা বিষয়ের উপর এতো বই লেখা সম্ভব হয়েছে যা বিশে আজও সমাদ্রিত। তবে চিকিৎসার উপর এতো বই লিখলেও এবং পেশায় তিনি ডাক্তার হলেও আসলে রসায়নবিদ হিসেবে ছিলো তাঁর নামডাক।

প্রতিটি ধাতুরই বিশেষ বিশেষ গুণ আছে, কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। জাবির এ সবের কথা ভালোভাবে জানতেন। গ্রীক দেশের বিজ্ঞানীরা তাঁর আগে এ সকল জিনিস নিয়ে সবচেয়ে বেশী গবেষণা করেছিলেন। তাঁদের জ্ঞান থেকেও এ সকল বিষয়ে জাবিরের জ্ঞান ছিলো আরো বেশী।

গ্রীক বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকেও তাঁর গবেষণা ছিলো

অনেক উন্নত। এর জন্য তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে সারা ইউরোপে। ইউরোপ যখন রসায়ন শিক্ষায় খুব উন্নত তখনও সেখানকার বিজ্ঞানীরা ধাতু সম্পর্কে তাঁর মতামত এক কথায় মেনে নিয়েছেন। আজ থেকে দু'শ বছর আগেও সেখানে তাঁর নামডাক ছিলো।

খনি থেকে তোলা কোন ধাতুই সব সময় একেবারে খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায় না। তার সাথে প্রায়ই কিছু আজে বাজে জিনিস মিশে থাকে। এসব বাদ দিয়ে কিভাবে আসল ধাতুটুকু বের করে নিতে হয় জাবির তা প্রথম দুনিয়াকে জানান। তাঁর এই জ্ঞান লোহার বেলায় তিনি সবচেয়ে বেশী কাজে লাগিয়েছেন আর এসবের কথা তিনি তাঁর বইপত্রে লিখে রেখে গেছেন। তাঁর বইয়ে এমনি আরো অনেক জিনিস তৈরীর নিয়মকানুন লেখা আছে।

কাপড় আর চামড়ার জন্যে পাকা রং, ওয়াটার প্রুফ কাপড়ে আর লোহার মরচে ধরা পরিষ্কার করা, বার্নিশ, চুলের নানা রকম কলপ ইত্যাদি তৈরীর কথা ও কৌশলও লেখা আছে তাঁর বইয়ে।

লেখার জন্য কম খরচে পাকা ও উজ্জ্বল রংয়ের কালি তৈরী করতে পারতেন তিনি। মার্কাসাইট থেকে জাবির এ রকম কালি তৈরী করেন। আগে খুব দামী ধাতু সোনা থেকে এই কালি তৈরী করা হতো।

কাঁচ তৈরীর কৌশল তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। রসায়নের গবেষণার কাজে লাগে এরূপ এ্যাসিটিক এসিড, নাইট্রিক এসিড তৈরীর কৌশলও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন।

জাবিরের একটা বড়ো গুণ ছিলো। তিনি লবণ তৈরী করতে পারতেন। প্রথমে তিনি লতাপাতা আর একটা জিনিস পুড়িয়ে ছাই করে পটাশ আর সোডা তৈরী করতেন। পটাশ আর সোডা এসিডের সাথে মিশিয়ে তিনি লবণ তৈরী করেছিলেন। গন্ধককে খারের সংগে তাপ দিয়ে সিলভার অব সালফার এবং মিল্ক অব

সালফার তৈরীর কৌশলও তিনি আবিষ্কার করেন।

গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হয় এমন ধাতু যেমন সাইট্রিক এসিড, আর্সেনিক, এ্যান্টিমনি, সিলভার নাইট্রেট, কিউপ্রিক ক্লোরাইড ইত্যাদি জিনিসের জ্ঞানও তাঁর যথেষ্ট ছিলো। তাছাড়া রসায়নের গবেষণা কাজে তিনি এসব জিনিস ব্যবহারও করেছেন এবং ভিট্রিওল, ফিটকিরি, সল্টফিটার ইত্যাদি অনেক রসায়নিক জিনিস তিনি তৈরী করতে পারতেন।

জাবির বলেছিলেন, রসায়নে গবেষণা করা চাট্টিখানি কথা নয়। রসায়নবিদদের সবচেয়ে বড়ো কাজ হচ্ছে হাতে–কলমে কাজ করা আর তার পরীক্ষা চালানো। হাতে কলমে কাজ না করলে কিংবা নিজে পরীক্ষা না চালালে রসায়ন নিয়ে পড়াশোনায় কোন ফয়দা হয় না। তাই সব ব্যাপারেই পরীক্ষা চালাতে হবে। তবেই পাওয়া যাবে সেই বিষয় সম্পর্কে পুরো ধারণা বা জ্ঞান।

জাবির আরো বলেছিলেন ঃ আমার ধন–দওলত, টাকা–পয়সা আমার ছেলেরা ভাইয়েরা ভোগ করবে। কিন্তু জ্ঞানের সাধনা করে আমি যা পেয়েছি, লোকে আমাকে কেবল তারই জন্যে স্মরণ করবে।

রকেট! রকেটের নামে কে না শুনেছে! মানুষ রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে পাড়ি দিচ্ছে। এটম বোমা–এই বোমা দ্বারা পৃথিবীকে করা যায় ধ্বংস। মানুষ ইচ্ছে করলে তা দিয়ে পারে বিশ্বকে নতুন করে গড়তে! রসায়ন নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করে আজ বিজ্ঞানীরা এগুলো আবিষ্কার করেছেন।

অনেক আরব বিজ্ঞানী এই রসায়নের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে অমর হয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে থেকে সবার আগে নাম করতে হয় জাবির ইবনে হাইয়ানের। তাঁর জ্ঞান সাধনা থেকেই আরব জগতে রসায়ন গবেষণা শুরু হয়। এমন কি তিনি সম্ভবত

সারা দুনিয়ারই প্রথম রাসয়নবিদ–বৈজ্ঞানিক।

তাঁর জ্ঞান সাধনা দেখে কে না অবাক হবে। আরো অবাক হবার মতো ব্যাপার, জাবির ছিলেন চিকিৎসকের ছেলে। কিন্তু তিনি কিনা চিকিৎসক না হয়ে হয়েছিলেন বিজ্ঞানী। বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞানীরা আজও তাঁর নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। রাসায়ন বিজ্ঞানের উপর তাঁর দেয়া বিভিন্ন পদ্ধতি এখনো গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হয়। তোমরা বড়ো হয়ে যখন রাসায়ন বিজ্ঞানের গবেষণা ও নানা রকম পরীক্ষা চালাবে তখন বুঝতে পারবে বিজ্ঞানে জাবিরের অবদান কত বেশী। তোমাদের জন্য কত কি আবিষ্কার করে গেছেন মহান বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ান।

এই মহান বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ান ৮০৪ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

মস্ত বড়ো এক ঐতিহাসিক

আমাদের প্রিয় নবী (সঃ)–এর ইন্‌তিকালের পর ইসলাম ধর্ম বহু দূর ছড়িয়ে পড়ে। সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার সব রকম ব্যবস্থা ইসলাম ধর্মে পাওয়া যায়। অন্য কোন ধর্ম এমন বাস্তব আর পরিপূর্ণ নয়। ইসলাম একটি সঠিক ধর্ম। সবচেয়ে বড়ো ও সত্য ধর্ম।

আমরা যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করি, ইসলাম ধর্মের নিয়ম–কানুন পালন করি, তাদেরকে বলা হয় মুসলমান। মুসলমানরা সাহসী জাতি। কোন কিছুতেই তাঁরা ভয় পান না। বড়ো বড়ো সিপাহসালার ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে। বড়ো হয়ে তোমরা তাঁদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে। তাঁরা নানা দেশ জয় করে ইসলামের বিজয় অভিযান চালিয়ে যান। তাঁর রাজ্য বহু দূর প্রসারিত করেন। সুদুর স্পেন, আফ্রিকা তাঁরা জয় করেছিলেন।

খৃস্টানরা ছিলো মুসলমানদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। মুসল–মানদের এরকম উন্নতিকে তারা মেনে নিতে পারছিলো না। মুসলমানদেরকে কিভাবে ধ্বংস করা যায় সেরকম কাজে তারা সর্বদাই লিপ্ত ছিলো।

একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর কথা। মুসলিম জাহানের অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। রাজা–বাদশাহ্‌, উজির–নাজির থেকে

শুরু করে সাধারণ মুসলমান পর্যন্ত সবাই তখন ইসলামের আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো। জ্ঞানের চর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। রাজা–বাদশারা ক্ষমতা লাভের জন্য সর্বদাই যুদ্ধ করতেন। জ্ঞান–বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জায়গা বাগদাদ তখন নিস্তব্ধ। মুসলমানদের স্পেন তখন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। উত্তর আফ্রিকাতেও একই অবস্থা বিরাজ করছিলো। খৃস্টানরা এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য নানা রকম চেষ্টা করতে লাগলো। তারা মুসলমানদের হাত থেকে দেশ উদ্ধার করতে তৎপর হয়ে উঠলো।

মুসলিম জাহানের যখন এমনি দুর্দিন, ঠিক সেই সময়ে উত্তর আফ্রিকার তিউনিস শহরে এক ছেলের জন্ম হয়। অনেক জ্ঞানের অধিকারী হন ছেলে। এই অসামান্য ছেলে পরে সারা দুনিয়ায় পরিচিত হন একজন বড়ো ঐতিহাসিক হিসেবে।

তাঁর কাছে জীবনের চেয়েও বেশী মূল্যবান ছিলো সত্য কথা। এ সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি যে কোন বিপদকেও তুচ্ছ মনে করেছেন। আমাদের এ যুগে এ রকম সাহসী মানুষের খুব অভাব। এখন তাঁর মতো ঐতিহাসিক ও সমাজবিদ বেঁচে থাকলে মানুষ সত্যকে জানতে পারতো। তাতে সমাজের অনেক ভালো হতো।

এই ছেলেটি জীবনে অনেক বড়ো হয়েছিলেন। তাই তো বর্তমান দুনিয়ার সবাই তাঁকে জানে। তাঁর নাম করে।

তাঁর নাম ইবনে খালদুন। নামটা খুবই সুন্দর। তাঁর পুরো নাম আবু জায়েদ ওয়ালী উদ্দীন ইবনে খালদুন। পিতার নাম মুহাম্মদ ইবনে খালদুন। পিতার বংশ মর্যাদা ছিলো খুব উচ্চ। পূর্বপুরুষেরা ছিলো দক্ষিণ আরবের কিন্দা গোত্রের লোক। খালদুন তাঁদের বংশগত খেতাব। খালদুনরা অভিজাত বংশের লোক ছিলেন। শিক্ষা, সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা ছিলো তাদের অনেক। দেশের খুবই নামকরা পরিবার বলে সবাই তাঁদেরকে সম্মান করতো। উচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞান

সাধনা করা ছিলো খালদুন বংশের ঐতিহ্য।

ইবনে খালদুন ৭৩২ হিজরীর ১লা রমযান তিউনিসে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা তিউনিসে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পূর্বপুরুষের নাম ওয়ালীউদ্দিন আবদুর রহমান। তিউনিসের বাদশাহ তাঁকে উজিরের পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন বাদশার অনুরোধে তিনি উজিরের পদ গ্রহণ করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর বাদশাহ্ খালদুনের পিতাকে উজিরের পদ নিতে বলেন। খালদুনের পিতা তাতে রাজি হলেন না। কারণ তিনি খুবই শান্তি প্রিয় লোক ছিলেন। অন্যায় কাজকে তিনি ঘৃণা করতেন। কোন রকম ঝামেলা তাঁর সহ্য হতো না। তাই রাজনীতির ঝামেলাকে তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। তাঁর জ্ঞান পিপাসা ছিলো খুব বেশী। পড়াশোনা করাকে তিনি অনেক বেশী ভালবাসতেন। সব সময় নীরবে বসে বসে তিনি পড়াশোনা করতেন।

ইবনে খালদুনেরও পড়াশোনায় ছিলো খুবই আগ্রহ। তিনি সহজেই অনেক কিছু মনে রাখতে পারতেন। কোন বিষয় এক–বারের বেশী পড়তে হতো না তাঁর।

শুধুমাত্র পড়াশোনায় তিনি ভালো ছিলেন তা নয়— তাঁর স্বভাব চরিত্র ছিলো খুব ভালো। কখনো মিথ্যে কথা বলতেন না তিনি। সত্য কথা বলা ছিলো তাঁর অভ্যাস। ছোটদেরকে স্নেহ, বড়দেরকে সম্মান করতেন তিনি। নিজের সুখের কথা ভাবতেন না। তিনি মিথ্যে ও অন্যায়ের কাছে কখনো মাথা নত করতেন না। অন্যায়কে খুবই ঘৃণা করতেন তিনি। সত্য কথা বলতে ও প্রচার করতে তিনি কাউকে ভয় করতেন না। গরীব লোকদের তিনি ভালোবাসতেন— মেলামেশা করতেন। গরীব লোকেরা তাঁকে তাদের বন্ধু ভাবতো। তাঁদের দুঃখ কষ্টের কথা তাঁর কাছে বলতো।

ইবনে খালদুনের পিতা একজন নামকরা আলেম ছিলেন।

তিনি ছোটবেলায় পিতার নিকট লেখাপড়া শুরু করেন। খালদুন যে জীবনে বড়ো জ্ঞানী হবেন তার পরিচয় ছোটবেলাতেই পাওয়া গিয়েছিলো। কুরআনের পড়া দিয়ে তাঁর জীবন শুরু হয়। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কুরআন মুখস্থ করে ফেললেন।

এবার শুরু উচ্চ শিক্ষার পালা। জন্মস্থান তিউনিসেই ইবনে খালদুন জ্ঞানের চর্চা শুরু করলেন। তিউনিস ছিলো তখন উত্তর আফ্রিকার জ্ঞান চর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। দেশ বিদেশ থেকে বহু পণ্ডিত ব্যক্তিরা এখানে আসতেন। আগত জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিকট তিনি নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন।

এমন ছেলেকে কে না জ্ঞানী বলবে? তিনি লেখাপড়া করার সময় শিক্ষকদের জীবনী ও গুণাবলী লিখে ফেলতেন।

শুধু কী তাই? কোন্ কোন্ বই তিনি পড়লেন তারও তালিকা লিখে গেছেন। মাত্র আঠারো বছর বয়স তখন। তিনি জ্ঞানের রাজ্য জয় করে ফেললেন। ফলে পরিচিত হয়ে উঠলেন জ্ঞানের জগতে।

সেই সময় তাঁর জন্মস্থান তিউনিসিয়াতে মহামারি দেখা দিয়েছিলো। হাজার হাজার লোক মারা গেলো। কার কান্না কে শোনে? কেউ কারো দিকে দেখে না। মরা মানুষের কবর দেওয়া তো দূরের কথা— পথে ঘাটে মরা মানুষের লাশ। আল্লাহ্র এই গজবকে ইবনে খালদুন নাম দিয়েছেন "একশা করা প্লেগ"। এই মহামারীর হাত থেকে তাঁর মাতাপিতা বাঁচতে পারলেন না। মাতা-পিতাকে হারিয়ে তিনি এতিম হলেন। এই বয়সে এমন অবস্থায় অনেকেই ভেংগে পড়ে। কিন্তু তিনি ভেংগে পড়লেন না।

ইবনে খালদুন? না, তিনি রাজা-বাদশা হতে চান নি। তিনি সাধারণ মানুষের ইতিহাস রচনা করেছেন। বিচিত্র তাঁর জীবন। তিনি অবাধে মানুষের সংগে মেলামেশা করেছেন। সাধারণ

মানুষকে ভালোবাসতে গিয়ে অনেক দুঃখ-কষ্ট তিনি পেয়েছেন। সব ধরনের লোকেরা তাঁকে ভালোবাসতো। মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে তিনি শান্তি পেতেন-সুখ পেতেন। রাজা-বাদশাহ্‌র যুদ্ধ জয় ও হত্যাকাণ্ডের কাহিনী তাঁর ইতিহাস নয়। তার ইতিহাস মানব সমাজের উত্থান-পতনের গতিধারার ইতিহাস।

বড়ো হয়ে তিনি বহু গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর মধ্যে যে গ্রন্থটি লিখে তিনি সারা দুনিয়ায় পরিচিত হয়েছেন তার নাম কি জানো? বিশ্ব ইতিহাসের মুখবন্ধ। এর নাম আরবীতে "মুকাদ্দিমা"।

শহরে যারা বাস করে, তাদের নিয়ে তাঁর লেখা, গ্রামের মানুষকে নিয়ে তাঁর লেখা। অনেকেই মনে করেন, ইতিহাস বুঝি মরা মানুষের কথা বলে। ইতিহাস শুধু রাজা-বাদশার কাহিনী।

ইবনে খালদুনের ইতিহাস কিন্তু ভিন্ন কথা বলে। তিনি পালটে দিলেন আগের সব ধারণা। আগের সব মত-সব কথা। নতুন কথা বললেন তিনি। ইতিহাস ও মানুষ সম্পর্কে একটি নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছেন তিনি। তার আগে কেউ এ ধারণা দিতে পারেন নি।

ইবনে খালদুন নিজের দেশকে খুব ভালবাসতেন। জন্মভূমি তাঁর কাছে ছিলো খুবই আদরের। নিজের দেশ ছেড়ে অন্য কোন দেশে চলে যাওয়াকে তিনি পছন্দ করতেন না। বলতে পারো? বিপদে না পড়লে কেউ কি কখন নিজের দেশ ছেড়ে চলে যায়? কখ্খনো না।

একবার সম্রাট তাঁর উপর খারাপ ধারণা নেন। কারণ জ্ঞানী লোকদের কদর অনেকে করতে পারেন না। মূর্খ সম্রাট কিছু কিছু খারাপ লোকের কথা কানে নিলেন। তারা খালদুনের নামে সম্রাটের নিকট অভিযোগ করেছিলো।

তখনকার সময়ে কেউ কোন সম্রাটের কুনজরে পড়লে তাকে অনেক শাস্তি পেতে হতো।

ইবনে খালদুন বাধ্য হয়ে জন্মভূমি তিউনিস ছেড়ে মিসরে চলে আসেন। এখানে জ্ঞান সাধনা করে তিনি খুব সুনাম অর্জন করেন।

তিনি এক আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না, যত বড়ো ক্ষমতাশালীই তিনি হোন না কেন। রাজা-বাদশাহদের তিনি সম্মান করতেন। কিন্তু তাঁদের কোন সময় ভয় করতেন না।

একটি ঘটনা বলছি শোনো।

তোমরা অনেকেই বাদশাহ তৈমুর লঙ্গের নাম শুনেছো। তিনি তুর্কিস্তানের বাদশাহ্ ছিলেন। তুর্কীস্তান বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়ার দখলে। সেই সময়ে তুর্কীস্তান আমাদের দেশের মত-স্বাধীন ছিলো। দেশটি ছিলো মুসলমানদের। দেশটির রাজধানী ছিলো সমরকন্দ। সমরকন্দ তখন অত্যন্ত উন্নত শহর ছিলো। শিক্ষা, সভ্যতা ও ধনসম্পদে তখন বিশ্বে এর তুলনা ছিলো না।

দেশের পর দেশ জয় করে বাদশাহ্ তৈমুর তাঁর রাজ্যের সীমা অনেক বৃদ্ধি করেন। লোকেরা তাঁকে বলতো দিগ্বিজয়ী বাদশাহ্। ভারত থেকে তুরস্ক পর্যন্ত প্রায় সব কয়টি দেশই তিনি জয় করেন।

৮০২ হিজরীতে তৈমুর লঙ্গ সিরিয়া আক্রমণ করে বসেন। মিসরের বাদশাহ তখন দেশটি শাসন করতেন। তাই তৈমুরকে বাঁধা দেওয়ার জন্য বাদশাহ্ সৈন্যসামন্ত নিয়ে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। তখন ইবনে খালদুন মিসরে ছিলেন। বাদশাহ্ ভাবলেন, ইবনে খালদুনের মতো একজন জ্ঞানী লোক সংগে থাকা ভালো। কখন কি পরামর্শের দরকার হয় তা কে জানে? তাই তাঁকেও সংগে নিলেন বাদশাহ্।

পায়ে হেঁটে বাদশাহ্র সৈন্যসামন্তের সিরিয়া পৌঁছুতে বেশ কয়েকদিন সময় লেগে গেলো। এরই মধ্যে তৈমুর সিরিয়া দখল

করে ফেললেন। মিসরের বাদশাহ্ সৈন্যদল নিয়ে হাজির হলেন সত্যি, কিন্তু যুদ্ধ করার মত সাহস আর তাঁর রইলো না। তৈমুর ছিলেন খুবই সাহসী বাদশাহ্। সারা দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্রা তাঁকে ভয় পেতেন। মিসরের বাদশাহ্ পরামর্শ করলেন ইবনে খালদুনের সাথে। খালদুন বাদশাহ্কে বললেন ঃ আমাদের সৈন্যবাহিনী কম, শক্তিও কম। যুদ্ধ করে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশী। তাই তিনি তৈমুরের সাথে আপোষ করার জন্য বাদশাহ্কে বললেন। বাদশাহ্ খালদুনের কথায় রাজি হলেন ; কিন্তু আপোষের কথা নিয়ে তৈমুর লঙ্গের সামনে যাবেন কে? কে করবেন এ কাজ? কার এতো বড়ো সাহস তৈমুরের সামনে গিয়ে কথা বলেন? বাদশাহ্ ভাবলেন, ইবনে খালদুনই এ কাজের উপযুক্ত লোক। কারণ ইবনে খালদুন খুবই সাহসী। সত্য কথা বলতে তিনি ভয় পান না। আর কাউকে দিয়ে এ কাজ হবে না। কেউ তৈমুরের সামনে যেতে রাজী হবেন না। বাদশাহ্র কথায় ইবনে খালদুন রাজী হলেন।

তৈমুরকে সংবাদ দেওয়া হলো, মিসরের বাদশাহ্র পক্ষ থেকে একজন লোক তাঁর সাথে দেখা করতে চান। তৈমুর অনুমতি দিলেন। সৈন্যরা পাহারা দিয়ে ইবনে খালদুনকে তৈমুরের তাঁবুতে নিয়ে গেলো। তৈমুরকে সালাম জানালেন খালদুন। তৈমুর ইবনে খালদুনকে ভালো করে দেখলেন এবং জানতে চাইলেন তিনি কি বলতে চান। খাদলুন তৈমুরের সাথে আদবের সাথে কথাবার্তা শুরু করলেন। তিনি বললেন, তাঁরা যুদ্ধ করবেন না যদি তৈমুর এখান-কার লোকের জানমালের নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। বাদশাহ্ তৈ-মুরকে সিরিয়া ছেড়ে দিয়ে তাঁর সাথে আপোষ করতেও রাজী আছেন যদি তিনি আর কোন রাজ্য আক্রমণ না করেন। বাদশাহ শান্তি চান। ইবনে খালদুন এসব কথা তৈমুরকে আদবের সাথে

সুন্দর করে বুঝিয়ে বললেন।

ইবনে খালদুনের সাহস ও জ্ঞানবুদ্ধি দেখে তৈমুর লঙ্গ অবাক হয়ে গেলেন! তিনি ইবনে খালদুনকে অনেক সম্মান ও সমাদর করলেন। তৈমুর খুব খুশী হলেন খালদুনের মতো জ্ঞানী লোকের দেখা পেয়ে। তিনি ইবনে খালদুনের সকল কথা মেনে নিলেন এবং সসম্মানে ইবনে খালদুনকে বিদায় দিলেন।

তৈমুরের ইচ্ছে ছিলো সারা আরব জয় করার। কিন্তু ইবনে খালদুনের কথায় তৈমুর এত খুশী হলেন যে, তিনি তাঁর সে সংকল্প ত্যাগ করলেন। সিরিয়ার লোকেরা আবার তাঁদের জীবন যাত্রা শুরু করলো। ইবনে খালদুন তাদের কাছ থেকে ভালবাসা পেলেন। সবাই তাঁকে খুব ভালবাসতো। কারণ তিনি তাদের অনেক উপকার করেছেন। ইবনে খালদুন জানতেন যুদ্ধ করে শান্তি আসে না, বরং মানুষের দুঃখ–কষ্ট বাড়ে। সুখ শান্তি নষ্ট হয়। মারা–মারি কাটাকাটি করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। আলাপ–আলোচনা ও আপোষের দ্বারা এ শান্তি স্থাপন সম্ভব।

তাঁর লেখা "আল মুকাদ্দিমা" গ্রন্থটি তাঁকে বিশ্ববিখ্যাত করেছে। এতে যে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় দুনিয়াতে এটি প্রথম। ইতিহাস কি? ঐতিহাসিকের কাজই বা কি? মানব জাতির উত্থান ও পতনের কারণও কোন্ জাতির উত্থান কত বছর স্থায়ী হয় ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন তাঁর লেখা এই বইতে। পৃথিবীতে এত বড়ো ইতিহাস আর কেউ রচনা করেন নি। তাঁর ইতিহাস থেকে তখনকার দুনিয়ার অনেক মূল্যবান কথা জানা যায়।

ইতিহাস! না, শুধুমাত্র ইতিহাস নয়। আইনের চুলচেরা হিসেবেও তাঁর জুড়ি নেই। কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা কেউ তাঁর মত এত সুন্দর করে দিতে পারেন নি। সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র–বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, মানব বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি—

এসব বিষয়েও তাঁর জ্ঞান ছিলো অগাধ।

মানব জাতিকে যে জ্ঞান তিনি দান করে গেছেন, জ্ঞানের রাজ্যে যে চিন্তাধারা তিনি রেখে গেছেন, তার জন্য মানব জাতির ইতিহাসে চিরদিন ইবনে খালদুন অমর হয়ে থাকবেন।

জ্ঞান সাধনার ফলে ইবনে খালদুন হলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও মস্ত বড়ো এক ঐতিহাসিক।